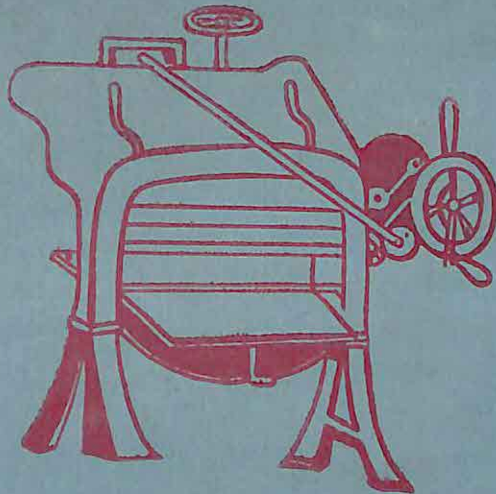




আত্মগঠন



Approved syllabus By the Board of Secondary Education, West Bengal from 1.1.74 as a Text Book on Work Education, Physical Education and Social Service including School performances for Classes VI, VII, VIII, of all Schools.

আত্মগঠন

(বৃত্তিশিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও সমাজসেবা)

প্রথম ভাগ

[ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

এস্. সাহা, এম. এ (ডবল) বি. কম্. বি. টি.
সহ-শিক্ষক রাণী ভবানী স্কুল, কলিকাতা-৬

ও

শ্রীমতী সুধা সেনগুপ্তা, বি, এ, (সিনিয়র ট্রেনড্)
শিক্ষয়িত্রী, গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা-৪

নিউ মডার্ণ বুক সিণ্ডিকেট
২৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন, ১৩৮০

প্রকাশক ঃ
এন্, সি, দত্ত,
২৬, বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
রেণু দাশগুপ্ত
দোলা প্রিণ্টার্স
৪।২এ, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড (বৃত্তিশিক্ষা)

দ্বিতীয় খণ্ড (খেলা-ধূলা)

অবতরণিকা

মানুষ সামাজিক জীব। দশজনের সঙ্গে বাস করাই তাহার স্বভাব। দশজনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সমাজের বাহিরে বাস করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। মানুষকে তাহার জীবনের বহু কাজই করিতে হয় অপরের সঙ্গে। কাজ করিবার জন্য তাহার সঙ্গী চাই, বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই তাহার সঙ্গী চাই। সুতরাং সমাজের বাহিরে সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। গ্রীসের বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিস্টট্‌ল্ ঠিকই বলিয়াছিলেন, যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে পারে, সে হয় দেবতা, না হয় পশু।

দৈনন্দিন জীবনের গতি প্রকৃতি যতই জটিল হইতেছে, মানুষের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরের সাহায্য ব্যতীত মানুষ অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইতে পারেনা ; যানবাহনের প্রয়োজন মিটাইতে পারেনা। পরস্পরের মধ্যে এই সহযোগিতা আছে বলিয়াই মানুষের জীবন এত সুন্দর হইয়াছে, এত সহজ হইয়াছে।

ব্যক্তির সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের জন্য পরস্পরের সহযোগিতার মূল্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে মানুষকে সব সময়ই পর নির্ভরশীল হইতে হইবে। আত্ম-নির্ভরশীলতা না থাকিলে কোন মানুষই বড় হইতে পারেনা। জীবনে উন্নতি করিতে হইলে মানুষকে ছেলেবেলা হইতেই নিজের কাজ নিজে করিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

মোটকথা, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা—এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অতি নিবিড়। তাই ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সমাজের কল্যাণও জড়িত। ব্যক্তির কল্যাণে সমাজের কল্যাণ, আবার সমাজের কল্যাণে ব্যক্তির কল্যাণ।

কাজেই প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য হইল সুন্দরভাবে সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া নিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।

কতগুলি অভ্যাস, প্রবৃত্তি এবং গুণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে এবং কতগুলি বিষয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে কোন ব্যক্তিই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারেনা। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সমাজ-কল্যাণের নানা উপায় জানিতে হয়।

যে শিক্ষার ফলে মানুষ আদর্শ ও সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপন করিতে পারে তাহাই সামাজিক শিক্ষা।

সামাজিক শিক্ষা বিভিন্নভাবে প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। বৃত্তি-শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, সমাজ-সেবা ও বিদ্যালয়-পরিচালনা প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বৃত্তি-শিক্ষা, শারীরিক-শিক্ষা, সমাজ-সেবা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এই সকল শিক্ষাও মানুষ তাহার পরিবেশের মধ্যেই অর্জন করিয়া থাকে। মানুষ শৈশবে যে শিক্ষা পায় তাহার পারিবারিক পরিবেশের বিভিন্ন কাজ-কর্মে, খেলার-মধ্যে ও বিদ্যালয়ের শ্রেণী-কক্ষে, পরিণত বয়সে মানুষ সে শিক্ষাই পাইয়া থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—শিল্প-বাণিজ্য কিংবা চাকুরীতে, ডাক্তারি কিংবা নার্সিং এর কাজে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিংবা সভা-সমিতিতে, স্কুল-কলেজের শিক্ষকতা কিংবা পরিচালনার কাজে। আজ যে শিশু ভবিষ্যতে সে হইবে জাতির পিতা। তাইতো কবি বলিয়াছেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"

ভবিষ্যত জীবনে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় হইতেই বিভিন্নমুখী কর্ম-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার বুনিয়াদের উপরই ভবিষ্যতের কর্ম-শিক্ষার ইমারত গড়িয়া উঠে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন যাবত আমাদের দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-নীতিকে

কেন্দ্র করিয়া। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই জীবন-ভিত্তিক ছিলনা। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি জাতির মেরুদণ্ডকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।

আজ যুগের প্রয়োজনে শিক্ষাকে জীবন-ভিত্তিক করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে তাই সম্পূর্ণ নূতন ধাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎও ১৯৭৪ এর শিক্ষাবর্ষ হইতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ের মতই কর্ম-শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, সমাজ সেবা ও স্কুলের সাংগঠনিক কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়কে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয় হিসাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের যাহাতে প্রকৃত আত্ম-উৎকর্ষের বিকাশ ঘটে তাহারই উদ্দেশ্যে "আত্মগঠন" পুস্তকখানি লিখিত হইল।

শিক্ষা—ইহার উদ্দেশ্য শ্রেণীবিভাগ

শিক্ষা কি ?—যাহা আমাদের সত্যের দিকে পরিচালনা করে, যাহা অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া চলে, যাহা মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে নিয়া চলে তাহাই শিক্ষা। ইহা উপনিষদের বাণী। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই একমাত্র বস্তু যাহা মানুষের আত্মচক্ষুকে উন্মীলিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়াছেন, "কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসেনা, সকল জ্ঞানই মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে।" ঋষি অরবিন্দও বলিয়াছেন, "শিশু নিজেই নিজের জ্ঞান আহরণ করে, যে জ্ঞান তাহার প্রকৃতি-কর্তৃক প্রদত্ত বা নির্ধারিত। শিক্ষক তাহার পথ প্রদর্শক মাত্র।" হারবার্ট স্পেনসার শিক্ষার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একটি পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্তুতিই হইল শিক্ষা।" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই কথাই বলিয়াছেন, "মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিকাশই আসল শিক্ষা।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ—শিশুর মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী করিয়া তোলাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আরও পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে শিক্ষার কাম্যই হইল জীবনের ভিত্তিকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা। জীবনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পরিবেশের প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী তাহার কর্ম বা বৃত্তি খুঁজিয়া বেড়ায়।

শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ ঃ—শিক্ষাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) পুথিগত শিক্ষা, (২) বাস্তবমুখী শিক্ষা।

পুথিগত শিক্ষা ঃ—বইপত্র পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যে জ্ঞান বা শিক্ষা আহরণ করে তাহা পুথিগত শিক্ষা।

বাস্তবমুখী শিক্ষা ঃ—বই পত্র না পড়িয়াও অনেকে হাতের কাজ করিয়া কিংবা তাহাদের অন্তঃস্থিত শক্তি বা সামর্থকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজে লাগাইয়া নানারকম শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই বাস্তবমুখী শিক্ষা।

বর্তমানকালে এই বাস্তবমুখী শিক্ষার উপর সকলেই খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহাকে জীবন-ভিত্তিক শিক্ষাও বলা যাইতে পারে। জীবন-ভিত্তিক বা বাস্তবমুখী শিক্ষা আবার বহু রকমের আছে। তাহাদের মধ্যে (ক) কার্য বা বৃত্তি শিক্ষা, (খ) শারীরিক শিক্ষা, (গ) সমাজসেবা—এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার কথাই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড

বৃত্তি শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

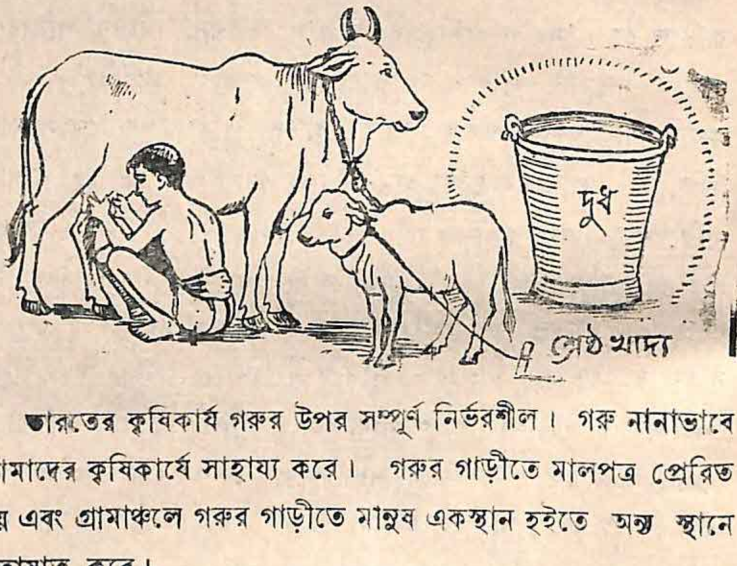
বৃত্তিশিক্ষা বা কর্মশিক্ষা

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে পুথিগত বিদ্যা অর্জন না করিয়াও মানুষকে জীবন ধারণের নানা প্রকার বৃত্তি বা কর্ম শিক্ষা করিতে হয়। সব পরিবেশে সব বৃত্তি সম্ভব হয়না। মানুষ পরিবেশের দাস। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। এক কথায় পরিবেশই শিক্ষক, আর বিভিন্ন পরিবেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার্থী। পরিবেশ দুই রকমের—(১) গ্রাম্য পরিবেশ, (২) নাগরিক পরিবেশ। আবার শিক্ষার্থীও দুই রকমের—(১) পুরুষ শিক্ষার্থী (২) মেয়ে শিক্ষার্থী। তাই গ্রাম্য পরিবেশে যেমন পুরুষ শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা কর্ম বা বৃত্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমনি নাগরিক পরিবেশেও পুরুষ শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা কর্ম বা বৃত্তির সুযোগ রহিয়াছে। তবে গ্রামাঞ্চলেই হউক কিংবা শহরাঞ্চলেই হউক এমন কোন কোন বৃত্তি বা কর্ম আছে যাহা আজকাল ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই গ্রহণ করিতে পারে। নিম্নে এই রকম কয়েকটি বৃত্তি বা কর্ম শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হইল।

পশুপালন

গো-পালনঃ—সভ্যতার প্রথম যুগ হইতেই মানুষ গবাদি পশু পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। গরুর দুগ্ধ অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। গরুর দুগ্ধ শিশু ও রোগীদের বিশেষ পথ্য। গো-দুগ্ধ হইতে ঘি, ছানা, মাখন, পণীর, দধি ও বহু রকমের মিষ্টি দ্রব্য তৈয়ার হয়। ইহা ছাড়া

গো-মাংস অনেক দেশে খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। গরুর চামড়া হইতে জুতা এবং খুর হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গরুর মল এবং মূত্র কৃষি জমিতে উন্নত সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোবরের ঘুটে গৃহস্থ ঘরে জ্বালানীরূপে কাজে লাগে। গো-মূত্রদ্বারা অনেক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং সেই ঔষধ অনেক কঠিন রোগে অব্যর্থ হিসাবে কাজে লাগে। গরুর হাড় দ্বারা নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয়।



ভারতের কৃষিকার্য গরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। গরু নানাভাবে আমাদের কৃষিকার্যে সাহায্য করে। গরুর গাড়ীতে মালপত্র প্রেরিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ীতে মানুষ একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে।

ব্যবহার অনুসারে গরুকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—দুগ্ধ প্রদায়ী গরু এবং মাংস প্রদায়ী গরু। দুগ্ধপ্রদায়ী গরু সাধারণতঃ দুগ্ধের জন্য প্রতিপালন করা হয় এবং মাংস প্রদায়ী গরু প্রধানতঃ মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

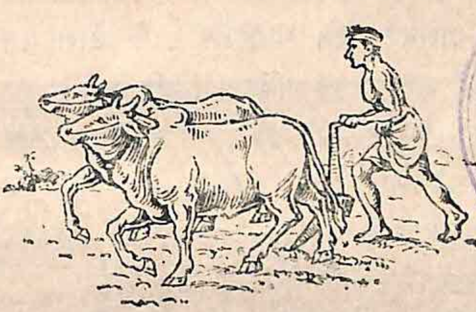
প্রাচীনযুগে আর্য মুনি ঋষিরা গরু পালন করিয়াই সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইতেন। অনেক রাজা মহারাজারা গরু পালন এবং গো-সেবা দ্বারাই বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী হইয়াছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত আমরা প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই।

বর্ত্তমানকালেও বহু ব্যক্তি গরু পালন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। গরু পালনের দ্বারা সুষম খাদ্যের সমস্যারই সমাধান হয় না, ইহার ফলে আমাদের এই গরীব দেশের বহু বেকারত্বের অবসানও ঘটে। ইহার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়। কোন কাজই এখন আর ছোট নাই। শ্রমের মর্য্যাদা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং গো-পালনের কাজে আমাদের সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে। তবেই সমাজের উন্নতি সম্ভব হইবে।

গো-পালনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ নজর দিতে হইবে।

১। কৃষিকার্যে গরুর ব্যবহার ঃ— প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিকার্যের সঙ্গে গরুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। জমিচাষ, গাড়ীটানা



ইত্যাদি কাজে গরু বা বলদ শক্তি জোগাইয়া থাকে। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করিয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের দারিদ্রতার জন্য এখনও কৃষিকার্যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। কাজেই কৃষিকার্যের জন্য কৃষকদের গরুর উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর কৃষি জমি রহিয়াছে। এই জমি কর্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ গরু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। কৃষিকার্যে সারের ব্যবহার ঃ— কৃষিকার্যে সার খুবই প্রয়োজন। গরুর গোবর এবং মূত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ফস্‌ফেট এবং পটাশ সার পাওয়া যায়।

প্রতিটি গরু দৈনিক অন্ততঃ ৬ কিলোগ্রাম গোবর এবং ৫ কিলোগ্রাম মূত্র দিলে বৎসরে প্রায় ১৩ কুইন্ট্যাল গোবর এবং ১২ কুইন্ট্যাল মূত্র পাওয়া যায়। এই পরিমাণ গোবর ও মূত্র হইতে বৎসরে প্রায় ১১ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৫ পাউণ্ড ফস্‌ফেট এবং ১০ পাউণ্ড পটাশ সার পাওয়া যায়। একটি মাত্র গরু হইতে যদি বৎসরে এই পরিমাণ সার পাওয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে ৪০ লক্ষ গরু হইতে কি পরিমাণ সার পাওয়া যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩। গরুর খাদ্য ঃ—তৃণ, ভুট্টা, যব, রাই ও ওটস, প্রভৃতি গরুর প্রধান খাদ্য। বিচালি, তুঁষ, ভূষি, খইল এবং ভাতের ফেনও গরুর আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তবে গরু প্রধানতঃ তৃণ খাইতেই বেশী ভালবাসে। খাদ্যের পরিমাণের উপরই গরুর দুগ্ধের পরিমাণ নির্ভর করে।

সুতরাং যেই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট তৃণের পরিমাণ বেশী সেখানেই গরু পালন করা সহজসাধ্য হয়।

৪। বিভিন্ন জাতের গরু ঃ— ভারতের সর্বত্রই প্রায় গরু দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামের গরু আকারে ছোট। এই অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর ঘাস জন্মাইলেও শীতকালে ঘাস থাকেনা বলিলেই হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের গরু দুধও কম দেয়।

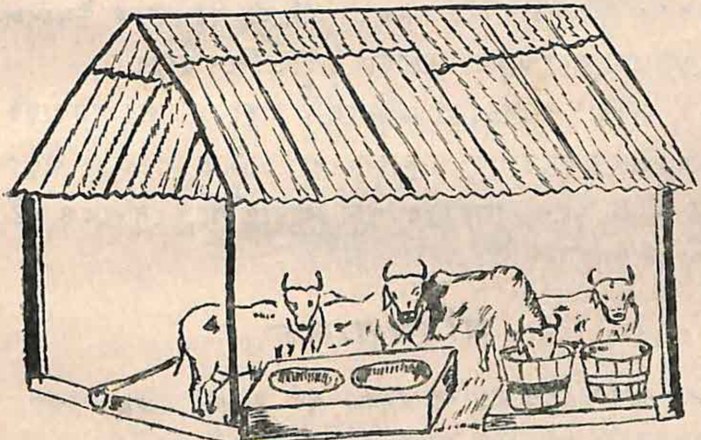
উত্তর প্রদেশ ও মধ্য পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রায় সারা বৎসরই ঘাস জন্মায়, এবং এই সকল স্থানের গরু সব দিক দিয়াই উৎকৃষ্ট। মধ্য পাঞ্জাবের গরুকে সাহীওয়ালী গাভী বা মূলতানী গাভী বলা হয়। ইহারা উত্তম দুগ্ধবতী, দেখিতেও খুব সুন্দর। এই জাতীয় গাভী দৈনিক প্রায় ৮ হইতে ১৬ কেজি দুধ দিয়া থাকে।

হরিয়ানা অঞ্চলের গরুকে হরিয়ানা গরু বলা হয়। এই জাতীয় গরু দৈনিক প্রায় ১০ হইতে ১২ কেজি দুধ দিয়া থাকে। হরিয়ানার বলদগুলি আকারে বেশ বড় এবং শক্তিশালী।

যোধপুরের গরুকে নাগোরা বলা হয়। ইহারা দুধ কম দেয় তবে এখানকার বলদগুলি পরিশ্রমী।

গুজরাটের গরুকে কঙ্করেজ গরু বলা হয়। ইহারা আকৃতিতে বেশ বড়। এই জাতীয় গরু দৈনিক প্রায় ১০ হইতে ১২ কে জি দুধ দেয়।

৫। বিভিন্ন দুগ্ধ কেন্দ্র ঃ— ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই সরকারী ও বে-সরকারী দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে একটি গো-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনেক উন্নত জাতের গরু আনিয়া প্রতিপালন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, বে-সরকারী উদ্যোগেও অনেক দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে।



৬। আদর্শ গো-শালা ঃ—সুন্দরভাবে গো-পালন করিতে হইলে গো-শালার প্রতি অত্যন্ত যত্ন নিতে হইবে। আদর্শ গো-শালার উপরেই গরুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। বর্ষাকালে যাহাতে জল না

জমে তাহার জন্য গো-শালা ঘরটি উচু জায়গায় হওয়া উচিত। ঘরটিতে যাহাতে আলো ও বাতাস চলাচল করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। ঘরটিকে সব সময়ই পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। গরুর সংখ্যা অনুযায়ী ঘরের আকার ঠিক করিতে হইবে। প্রতিটি গরুর জন্য কমপক্ষে ৫ হইতে ৬ ফুট চওড়া জায়গা রাখা দরকার। গরুর সংখ্যা বেশী হইলে ইহাদিগকে দুই সারিতে রাখাই ভাল। মেজেটি কংক্রিট-বাধানো হইলেই ভাল হয়। গরুর মূত্র যাহাতে সরিয়া যায় ইহার জন্য নর্দমার দিকে ঘরটি ঢালু রাখিতে হইবে। গরুর খাদ্য রাখিবার জন্য লম্বা চৌবাচ্চা তৈয়ার করিতে হইবে এবং জল যাহাতে সরিয়া যায় ইহার জন্য চৌবাচ্চার নীচে ছোট ছিদ্র রাখিতে হইবে।

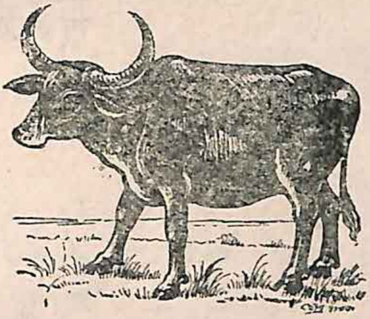
৭। প্রসবকালে গরুর প্রতি যত্ন ঃ—এই সময়ে গরু যাহাতে লোকজন কিংবা অন্য কিছুকে ভয় না পায় ইহার জন্য গরুকে নির্জন জায়গায় রাখিতে হইবে। নরম জায়গায় গরুকে শোয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গরুর নিকটেই কিছু কচি ঘাস রাখিতে হইবে যাহাতে গরু ইচ্ছামত খাইতে পারে। প্রসবের পর গরুকে উষ্ণজলে ভূষি, গুড় এবং লবণ একত্রে মিশাইয়া খাইতে দিতে হইবে।

৮। নবজাত বাছুরের যত্ন ঃ—নবজাত বাছুরকে গরুর নিকটেই রাখিতে হইবে যাহাতে গরু বাছুরের দেহ চাটিতে পারে। বাছুর যাহাতে মাঝে মাঝে গরুর দুধ পান করিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মহিষপালন

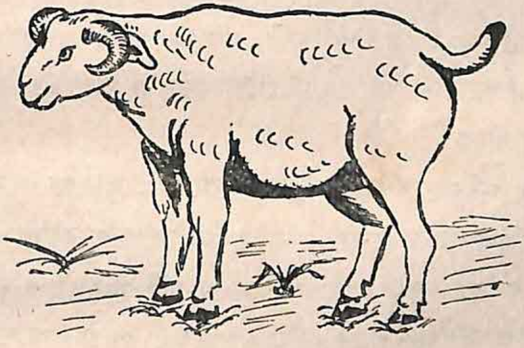
গরুর ন্যায় মহিষও মানুষের নিকট খুব উপকারী জন্তু। গরুর দুধ ও মহিষের দুধ প্রায় একই রকমের। তবে মহিষের দুধে অধিক ঘি ও মাখন তৈয়ার হয়। মহিষের দুধের পরিমাণও বেশী। পশ্চিমবঙ্গে একটি মহিষ দৈনিক অন্ততঃ ২০ হইতে ২৫ কেজি দুধ দেয়। গরু অপেক্ষা মহিষ পরিশ্রমীও বেশী।

সুতরাং গরুর ন্যায় মহিষ প্রতিপালন করিলেও আমাদের বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হয়। কেননা বহু লোক আজকাল মহিষ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।



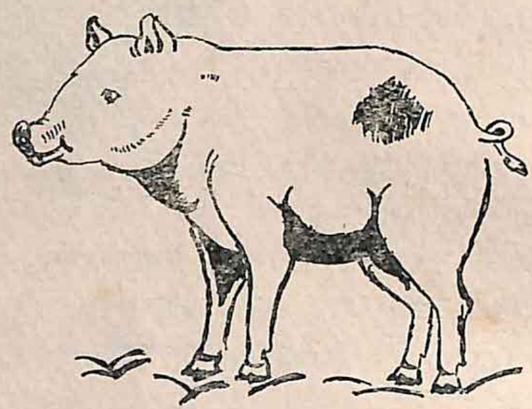
সামান্য পার্থক্য ব্যতীত মহিষের পালন-পদ্ধতি গরুর পালন- পদ্ধতির মত একই রকমের। তবে গরুর ন্যায় মহিষ বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না। মহিষ খোলা জায়গায় জলে-কাদায় থাকিতে ভালবাসে।

মেষপালন ঃ—বর্তমানযুগে প্রধানতঃ মাংস ও পশমের জন্য মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষ হইতে দুগ্ধও পাওয়া যায়।



মেষ ক্ষুদ্রকায় তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে। সেইজন্য তৃণভূমি অঞ্চল মেষ-পালনের উপযোগী। পাহাড়ের উঁচু-নীচু জমি মেষ-পালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষ ভাল থাকে। কিন্তু অত্যধিক শীতল আবহাওয়ায় মেষের পশম নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে বহু লোক মেষ-পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

শূকর পালন

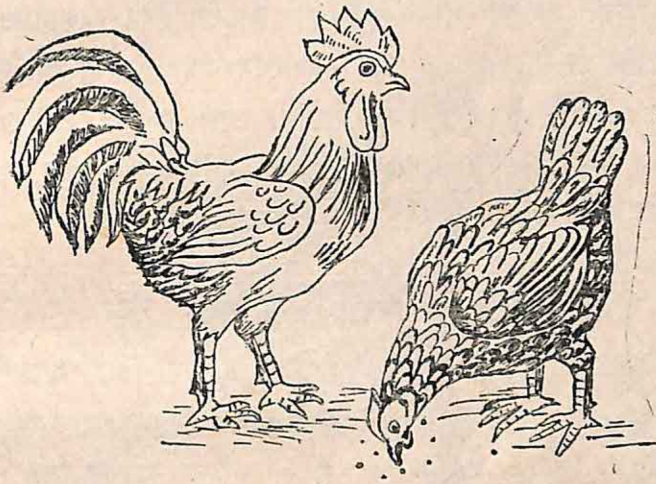


প্রধানতঃ মাংস ও চর্বির জন্যই শূকর প্রতিপালিত হয়। অন্য মাংস অপেক্ষা শূকরের মাংসে প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর উপাদান বেশী পরিমাণে থাকে।

শূকর অতি দ্রুত বংশ বিস্তার করে। সামান্য খরচেই অধিক শূকর প্রতিপালন করা যায়। নিকৃষ্ট জিনিস ও আবর্জনা খাইয়াও শূকর বাঁচিতে পারে। ভুট্টা খাইলে শূকরের চর্বি ও মাংস বৃদ্ধি পায়। ওক গাছের ফল খাইয়াও শূকর বাঁচিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ শূকর পালনের পক্ষে উত্তম ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে অনেক জলা-জায়গা রহিয়াছে। শূকর জলা-জায়গাতে থাকিতেই ভালবাসে। গৃহপালিত অন্যান্য জন্তুর মত ইহাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয় না। ঘরে প্রতিপালন করিলেও ইহাদের জন্য ব্যয় বহুল ঘর তৈয়ার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। একটি ঘরে এক সঙ্গে অনেকগুলি শূকর বাস করিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও আজকাল বহুলোক শূকর প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুর্গী পালন



মুর্গী হইতে আমরা ডিম ও মাংস দুই-ই পাইয়া থাকি। স্বাস্থ্যের জন্য এই দুইটি জিনিস আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। খাদ্যের কথা চিন্তা করিয়া এবং জীবিকা নির্বাহের কথা ভাবিয়া আমাদের দেশে মুর্গী পালনের বা তাহার রক্ষণাবেক্ষণের যে আবশ্যকতা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আজকাল অনেক পুঁজিপতি হাজার হাজার টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া মুর্গী পালন-কেন্দ্র খুলিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকারও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন। ভারত সরকার প্রতিটি জিলায় মুর্গী পালন-কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ভাল ভাল জাতের বিদেশী মুর্গী আমদানী করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আমরাও ইচ্ছা করিলে নিজের বাড়ীতে ৬।৭টি মুর্গী অনায়াসেই পালন করিতে পারি। বাড়ীর কাছে যদি একটু জায়গা থাকে তাহলে অন্ততঃ ২৫।৩০টি মুর্গী পালন করা যায়। ইহার ফলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধানও হইবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের পথও হইবে।

বিভিন্ন জাতের মুর্গী ঃ—মুর্গী নানা জাতের হয়। কোন জাতের মুর্গী ডিম বেশী দেয়, আবার কোন জাতের কম। দেশী মুর্গী বৎসরে প্রায় ৫০।৬০টি ডিম দেয়, কিন্তু বিদেশী ভাল জাতের মুর্গী বৎসরে প্রায় ১৫০।২০০ ডিম দেয়। বিদেশী মুর্গী দেশী মুর্গী অপেক্ষা আকারেও বড়, ওজনেও বেশী। এই কারণে এইগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিদেশী মুর্গীও আবার বিভিন্ন শ্রেণীর আছে।

১। 'রহোড় আইল্যাণ্ড রেড' জাতীয় মুর্গী—ইহা আমেরিকীয় জাতের মুর্গী। এই মুর্গী খুব মোটা ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাদের রং খয়ের ধরণের। ডিমের রং বাদামী। ইহারা অধিক সংখ্যায় ডিম পাড়ে, ইহাদের ওজনও বেশী। ভারতে এই জাতের মুর্গী খুব সমাদর লাভ করিয়াছে।

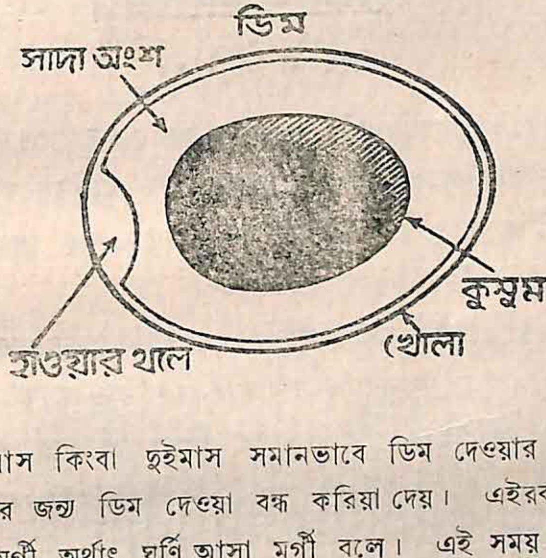
২। লেগ হর্ণ ঃ—এই জাতের মুর্গী সাদা রংয়ের হয়। ওজনে এই জাতের মুর্গী রহোড় জাতের মুর্গী অপেক্ষা কিছু হাল্কা হইলেও এইগুলি ডিম দেয় সর্বাপেক্ষা বেশী।

৩। ব্ল্যাক মিনারকা ঃ—এই জাতের মুর্গী কাল রংয়ের হয়। ইহারা আকারে ও ওজনে লেগ হর্ণ অপেক্ষা কিছু বড় ও ভারী। এই জাতের মুর্গীও অধিক সংখ্যায় ডিম দেয়।

৪। প্লাই মাউথরাক ঃ—ইহারাও আমেরিকীয় জাতের মুর্গী। ইহাদের পায়ে কাল কাল দাগ থাকে। চক্ষু ও পায়ের পাতা হলুদ রংয়ের হয়। এই জাতীয় মুর্গীর ডিম আকারে খুবই বড়। ইহারা ডিমও দেয় অধিক সংখ্যায়। এই ধরণের মুর্গীগুলি দেখিতে খুব সুন্দর।

এই চারি শ্রেণীর মুর্গী ছাড়া অন্যান্য ধরণের মুর্গীও আছে।

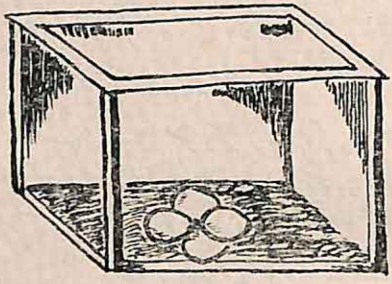
ডিম হইতে বাচ্চা :—মুর্গীর বয়স ছয়মাস হইলেই ডিম দিতে আরম্ভ করে। মোরগ ও মাদা (স্ত্রী) মুর্গীর মিলনের পর মুর্গী যে ডিম পাড়ে একমাত্র সেই ডিম হইতেই বাচ্চা হয়। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল। মুর্গীর সাথে মোরগের যদি মিলন নাও হয় তবু মুর্গী ডিম দিবে এবং যতদিন ইহারা বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন সমানে ডিম দিয়া যাইবে। তবে ঐ ডিম হইতে কোন বাচ্চা হইবে না। কেননা ঐ ডিমে কোন জীব থাকে না।



একমাস কিংবা দুইমাস সমানভাবে ডিম দেওয়ার পর মুর্গী কিছুদিনের জন্য ডিম দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এইরকম মুর্গীকে 'কুড়ক' মুর্গী অর্থাৎ ঘুর্ণি আসা মুর্গী বলে। এই সময় ঐ মুর্গীকে বাচ্চা তোলবার জন্য ডিমের উপর বসাইতে হয়। একটি মুর্গী এক সাথে ১০।১২টি ডিমে তা দিতে পারে। একুশ দিনে মুর্গী বাচ্চা তোলে।

মুর্গী যাহাতে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া ডিমে তা দিতে পারে ইহার জন্য একটি খাঁচা তৈয়ার করা দরকার। খাঁচাটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে ১৫।১৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৮।৯ ইঞ্চি হইবে। খাঁচাটি

কাঠের হইলেই ভাল হয়। খাঁচাটির মেঝেতে ৩।৪ ইঞ্চি মোটা করিয়া ধানের তুষ কিংবা ভূষি দিয়া ভরিয়া দিতে হইবে।



ডিমে তা দিবার ঘর

খাঁচার কাছাকাছি মুর্গীর খাবারের জন্য একটি পাত্রে কিছু গম যব, ভুট্টার দানা, চালের ক্ষুদ ইত্যাদি মিশাইয়া রাখিতে হইবে এবং অন্য একটি পাত্রে পরিষ্কার জল থাকিবে, যাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাইলে মুর্গীকে খাঁচা ছাড়িয়া দূরে যাইতে না হয়।

ডিম হইতে বাচ্চা যখন বাহির হইয়া আসে তখন বাচ্চার শরীরে হাত দিতে নাই। কেননা তখন বাচ্চার দেহ ভিজা থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাতাসে বাচ্চার দেহ শুকাইয়া গেলে তারপর হাত দিতে পারা যায়।

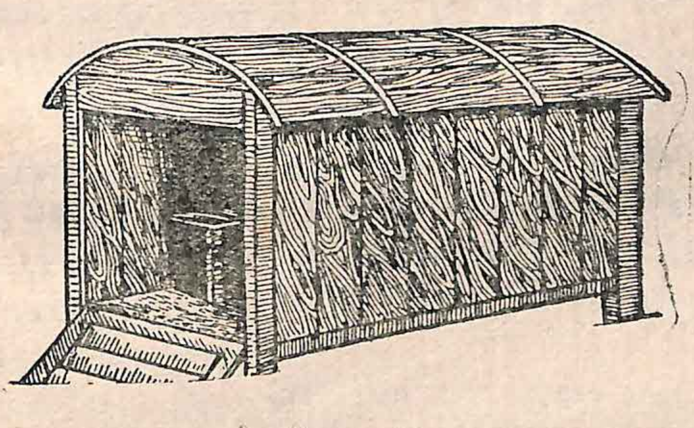
আজকাল আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যেও বাচ্চা তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সব মুর্গী পালন কেন্দ্রে হাজার হাজার সংখ্যায় মুর্গী পালন করা হয় এবং যেখানে হাজার হাজার সংখ্যায় ডিম হইতে বাচ্চা তোলা হয় সেসব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের নাম 'ইন্‌কিউওয়েটার'। এই যন্ত্র বড় ও ছোট সব রকমেরই আছে।

মুর্গীর বাচ্চার পালন ও পোষণ ঃ—বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়া আসিলেই মুর্গীটিকে বাচ্চা সহ একটি কূপের মধ্যে বসাইয়া দিতে

হইবে। খোলা জায়গায় কূপটিকে রাখিতে হইবে। বিড়াল ও ইঁদুরের হাত হইতে বাচ্চাগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। বাচ্চাদের দেহে যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইভাবে রাখিবার পর প্রায় ১০।১২ দিনের মধ্যেই মায়ের সাথে বাচ্চাগুলি যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার যোগ্য হয়।

আজকাল কৃত্রিম উপায়েও বাচ্চাদের পালন করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেসব মুর্গী পালন কেন্দ্রে মেসিনের সাহায্যে বাচ্চা উৎপন্ন হয় সেখানে বাচ্চাদের গরম রাখিবার জন্য এক বিশেষ প্রকারের ঘর তৈয়ারী করা হয়। এই ঘরগুলিকে বলা হয় 'ফাষ্ট মাদার'। এই ঘরগুলিতে ইলেকট্রিক হিটার কিংবা কেরোসিন তৈলের ল্যাম্প জ্বালাইয়া গরম রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

মুর্গীর বাচ্চাদের খাদ্য ঃ—প্রথম অবস্থায় বাচ্চাদের গোটা শস্য খাইতে দিতে নাই। দেড়-দুই মাসের হইলে বাচ্চাদের গোটা দানা দিতে হয়। ঘরের সম্মুখে শস্য ছড়াইয়া দিতে হইবে।



মুর্গীর বাসস্থান

মুর্গীর বাসস্থান ঃ—অধিক সংখ্যায় মুর্গী পালন করিতে হইলে ইঁটের দ্বারা নির্মিত ঘরই মুর্গীর বাসস্থানের পক্ষে ভাল। অল্প সংখ্যায়

মুর্গী পালন করিতে হইলে কাঠের তৈয়ারী ছোট ঘরেও চলে। ঘরটি যদি ৬ ফুট দৈর্ঘে ও ৬ ফুট প্রস্থে হয় তাহা হইলে ৩৬ বর্গফুটের মধ্যে অন্ততঃ ১২টি মুর্গী আরামে থাকিতে পারে। বর্ষার জল যাহাতে ঘরে ঢুকিতে না পারে সেদিকে খুবই দৃষ্টি দিতে হইবে। ঘরের মধ্যে জানালা থাকা দরকার যাহাতে আলো বাতাস ভালভাবে প্রবেশ করিতে পারে। দরজার সম্মুখভাগে সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখিলেও ভাল হয়। ঘরের মেঝেতে কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি নরম জাতীয় জিনিস বিছাইয়া দিতে হইবে যাহাতে মুর্গীর দেহে কোন আঘাত লাগিতে না পারে। কুকুর, বিড়ালের হাত হইতে ইহাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। পুরাতন মুর্গী ও নূতন মুর্গী একসাথে রাখা উচিত নয়। কেননা ইহাতে নূতন মুর্গীর দৃষ্টিহীনতা রোগ দেখা দিতে পারে।

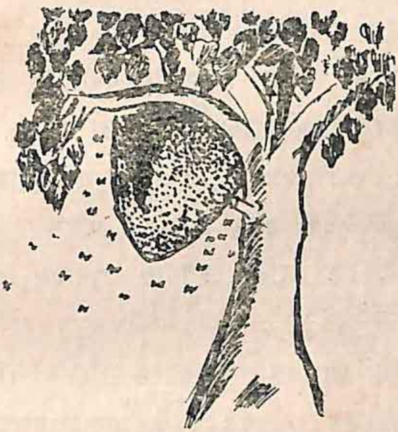
মুর্গীর খাদ্য—মুর্গীর খাদ্যের উপর ইহার ডিমের সংখ্যা নির্ভর করে। মুর্গীর খাদ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

চিনাবাদাম	ছোলা
গমের ভূষি	শুষ্ক মাছের গুঁড়া
গম	চুনা পাথর
ভুট্টা	খনিজ লবণের মিশ্রণ

এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া মুর্গীর ঘরে একটি ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ঘরের মুর্গীগুলি সকালবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে। খাদ্যের পাশে পরিমাণমত জলের ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মৌমাছি পালন



মৌমাছি মানুষের উপকারী বন্ধু। উহারা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া লইয়া আসে। এই মধু খুব পুষ্টিকর খাদ্য। অধুনা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মৌমাছি পালন একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পল্লীবাসী ও শহরবাসীগণ তাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য অল্প শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে মৌমাছি পালন করিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শস্যক্ষেত্র ও বাগানগুলিতে মধুভরা অজস্র ফুল ফুটিয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা প্রকৃতির দান এই মধু সংগ্রহ করিয়া লাভবান হইতে পারি।

মৌমাছি পালন করিলে কৃত্রিম বাসায় উহারা মধু সঞ্চয় করে। একপ্রকার কাঠের বাক্স উহাদের বাসার কাজ করে। ঐ বাক্সের কৃত্রিম চাকে উহারা সব ঋতুতে মধু সঞ্চয় করে। সেই চাক হইতে সহজেই মধু নিষ্কাশন করা যায়।

আজকাল বাজারে মধুর চাহিদা প্রচুর এবং ইহার মূল্যও বেশী। সুতরাং মৌমাছি পালন করিলে মধু বিক্রয় করিয়া প্রচুর টাকা উপার্জন করা যায়।

মৌমাছির শ্রেণী বিভাগ :—সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মৌমাছি দেখা যায়—(১) ভারতীয় মৌমাছি, (২) পাহাড়ে বা বাঘা মৌমাছি, (৩) ক্ষুদে মৌমাছি।

মৌমাছি পালনের জন্য ভারতীয় মৌমাছি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মৌমাছিদিগকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—(ক) রাণী বা স্ত্রী মৌমাছি, (খ) কর্মী মৌমাছি, (গ) পুরুষ মৌমাছি। ইহাদের মধ্যে কর্মী মৌমাছি বেশী কাজ করিয়া থাকে। কর্মী মৌমাছি মৌচাকের কোষ হইতে বাহির হইবার পরদিন হইতেই কাজে লাগিয়া যায়।

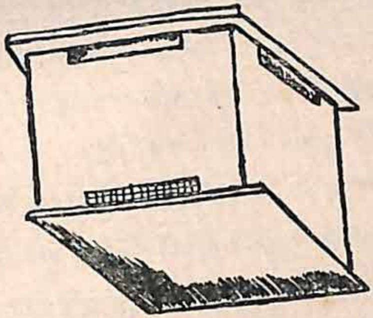
মৌমাছির খাদ্য মধু এবং বাচ্চাদের খাদ্য মধুমিশ্রিত পরাগ। মৌমাছির দেহ হইতে যে মোম নিঃসৃত হয় তাহা দ্বারাই মৌমাছির বাসা তৈয়ার হয়। এক কিলো মোম তৈয়ার করিতে মৌমাছিকে প্রায় ৩২ কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করিতে হয়। তবে মোম পাইতে হইলে মৌচাক নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং মোমের জন্য চাক নষ্ট করা লোকসান। কেবলমাত্র মধুর জন্যই মৌমাছি পালন করিলে লাভবান হওয়া যায়।

মৌমাছি পালনের সরঞ্জাম

১। মৌ-বাক্স :—মৌ-বাক্স দুই অংশে বিভক্ত—(১) নিম্নের অংশকে বলা হয় বাচ্চাঘর। ইহা আয়তনে বড় হইবে। (২) উপরের অংশকে বলা হয় মধুঘর। ইহা আয়তনে ছোট হইবে।

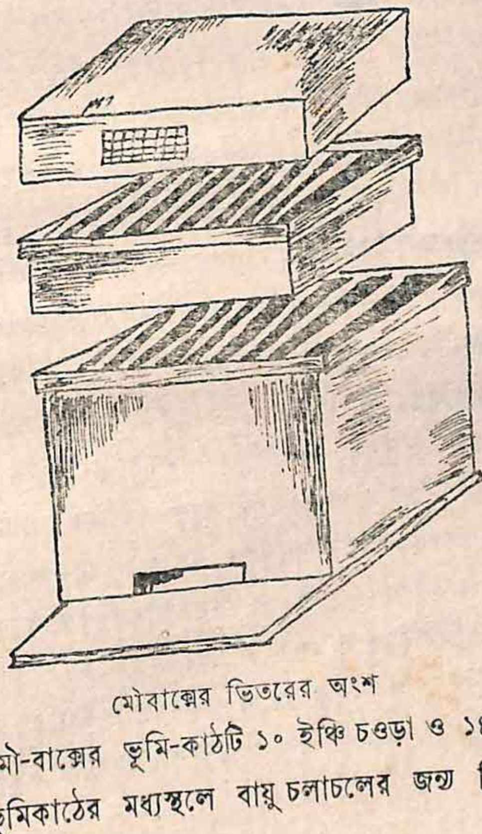
মৌমাছির বাক্স অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু কাঠ দিয়া তৈয়ার করিলে ভাল হয়। বাচ্চাঘর ও মধুঘর দুইটিরই ভিতরের মাপ হইবে নয় ইঞ্চি লম্বা

ও সাড়ে নয় ইঞ্চি চওড়া। বাচ্চাঘর মধুঘরের মাঝখানে খাঁজ রাখিতে হইবে। এই খাঁজে ফ্রেম ঝুলাইয়া দিতে হয়। বাচ্চাঘরের নীচের



মৌবাক্স

দিকে মৌমাছির প্রবেশের জন্য সিকি ইঞ্চি স্থান ফাঁক রাখিতে



মৌবাক্সের ভিতরের অংশ

ইবে। মৌ-বাক্সের ভূমি-কাঠটি ১০ ইঞ্চি চওড়া ও ১৪ ইঞ্চি লম্বা হইবে। ভূমিকাঠের মধ্যস্থলে বায়ু চলাচলের জন্য ছিদ্র রাখিতে

হইবে। ছিদ্রটি জাল দিয়া ঢাকা থাকিবে। মৌ-বাক্সের বাচ্চাঘর ও মধুঘর উভয়ের মধ্যে চাক-নির্মাণের জন্য ৭টি করিয়া ফ্রেম ঝুলাইয়া দিতে হইবে। ফ্রেমগুলি পরস্পর হইতে সিকি ইঞ্চি দূরে থাকিবে।

২। পত্তন :—যে ভিত্তির উপর মৌমাছিরা চাক প্রস্তুত করে তাহাকে পত্তন বলা হয়। মোমের পাতলা পাতের উপর যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করিয়া পত্তন তৈয়ার করা হয়।

৩। চিনির পাত্র :—মৌমাছিরা যাহাতে রস পান করিতে পারে তাহার জন্য চিনির সিরাপ ভর্তি একটি শিশির মুখ এক টুকরা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফ্রেমগুলির উপর উল্টাইয়া রাখিতে হইবে।

৪। রাণী ধরিবার খাঁচা :—সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া দিয়াশলাই বাক্সের মত একটি ছোট বাক্স তৈয়ার করিতে হইবে। রাণী ধরিবার জন্য এই খাঁচা প্রয়োজন। এই খাঁচার পাঁচদিক বন্ধ ও একদিক খোলা থাকিবে।

৫। ফ্রেম ষ্ট্যাণ্ড :—মৌ-বাক্সের চাক পরীক্ষার সময় ফ্রেমগুলি রাখিবার জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডের প্রয়োজন হয়। ইহাকে ফ্রেম ষ্ট্যাণ্ড বলে।

৬। যন্ত্রাদি :—মৌমাছি পালনের জন্য পিচকারী, ধূনুচি, হাতলযুক্ত লম্বাছুরি, কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

৭। মধু নিষ্কাশন যন্ত্র :—কৃত্রিম চাকের মধু সংগ্রহের জন্য মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

৮। মৌমাছি সংগ্রহ ও রক্ষণ :—নির্ভরযোগ্য স্থান হইতে ৪।৬ খানি চাকযুক্ত মৌমাছি ও ডিমপূর্ণ চাক কিনিয়া আনিতে হইবে। একটি রাণী ঐ চাকগুলিতে রাখিতে হইবে। চাকগুলি মৌ-বাক্সের উপরে রাখিতে হইবে। একমাস পরে মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মৌমাছিকে চিনির সিরাপ খাইতে দিতে হইবে। বাচ্চাঘরের সব ফ্রেমগুলি মৌমাছিতে ভরিয়া গেলে বাচ্চাঘরের উপরে একটি মধুঘর বসাইয়া মধু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মধুঘরের ফ্রেমগুলি মধুতে

পূর্ণ হইলে পর ঐ মধুঘরের নীচে আর একটি ফ্রেমসহ দ্বিতীয় মধুঘর বসাইতে হয়। উপরের প্রথম মধু ভালভাবে পরিপক্ক হইলে ঐ মধু নিষ্কাশন করিয়া লওয়া হয়। কিছুকাল পরে আবার দ্বিতীয় মধুঘর হইতে মধু নিষ্কাশন করা হয়। এইভাবে চাক হইতে একাধিকবার মধু পাওয়া যায়।

৯। মধু নিষ্কাশন পদ্ধতি ঃ—মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু নিষ্কাশন করা উচিত। কেননা ইহাতে মৌ-চাক অক্ষত থাকে। প্রথমে মধুপূর্ণ চাক মৌ-বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইয়া কোষগুলির মোম ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে। মোম পরিষ্কার করিবার পর চারিখানি মধুপূর্ণ চাক ফ্রেমসহ মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের খাঁচার মধ্যে বসাইতে হইবে। খাঁচার ভিতরে চারিপার্শ্বে চারিটি ফ্রেম রাখিতে হইবে। তারপর যন্ত্রের হাতল ঘুরাইলে চাকগুলি হইতে মধু বাহির হইয়া পাত্রের মধ্যে পড়িবে। চাকগুলির একদিকের মধু বাহির হইলে ফ্রেম চারিটিকে উল্টাইয়া পুনরায় হাতল ঘুরাইতে হইবে। এইভাবে চাকগুলির অপর পার্শ্বের মধুও বাহির হইয়া আসে। মধু নিষ্কাশনের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে মৌমাছিরা ভয় পাইয়া পালাইতে না পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাদুর প্রস্তুত প্রণালী

মাদুর ঘাসকে সাধারণতঃ মাদুর কাঠি বা মসিনা কাঠি বলা হয়। ইহা একপ্রকার জলজ বা ক্ষেত্রজ ঘাস। ইহা চারা খাল, বিল. পুকুর বা নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মাদুর কাঠির চারা একবার রোপণ করিলে চারি বৎসর পর্যন্ত চলে। তারপর পুনরায় নূতন চারা রোপণ করিতে হয়। ইহার কাঠি সাধারণতঃ কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাসের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হয়। মাঘ মাসের পর কাঠি কাটিলে উহা শক্ত হইয়া যায়। ফলে মাদুর বোনার কাজ ভাল হয় না।

মাদুর প্রস্তুত ভারতের একটি বিখ্যাত কুটির শিল্প। মাদুর—কাঠি হইতে প্রস্তুত করা হয়। সামান্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া অনায়াসেই মাদুর প্রস্তুত করা যায়। আজকাল বহু লোক এই কুটির শিল্পের সাহায্যে নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতেছে।

মাদুর কাঠি দুই শ্রেণীর—(১) সরু মাদুর কাঠি, (২) মোটা মাদুর কাঠি। সরু কাঠি ও মোটা কাঠি অনুসারে মাদুরের শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। সরু কাঠির মাদুরে সুন্দর নক্সা করা যায়, কিন্তু মোটা কাঠির মাদুরে কোন নক্সা করা যায় না। সরু কাঠির মাদুরে দুই রকম ভাবে নক্সা অঙ্কিত করা যায়—(১) মাদুর বুনিবার পর ইহার উপর নক্সা অঙ্কিত করা যায়, (২) দুইটি পৃথক পাত্রে সবুজ ও লাল রং জলে গুলিয়া উহাতে মাদুর কাঠিগুলি ভিজাইয়া লইবার পর শুষ্ক করিয়া বুনিতে হয়।

প্রথমে ক্ষেত্র বা জলীয় জায়গা হইতে মাদুর কাঠিগুলি কাটিয়া আনিতে হইবে। তারপর কাঠিগুলিপ্রয়োজনমত কাটিয়া নিতে হইবে। ঠিক ঠিক মাপমত কাটিয়া নিয়া কাঠিগুলি সূতার দ্বারা মজবুত

করিয়া বুনিতে হইবে। বুনন শেষ হইলে প্রান্তগুলি মুড়িয়া সেলাই করিতে হইবে এবং সূতার প্রান্তগুলি তিন চারিটি একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

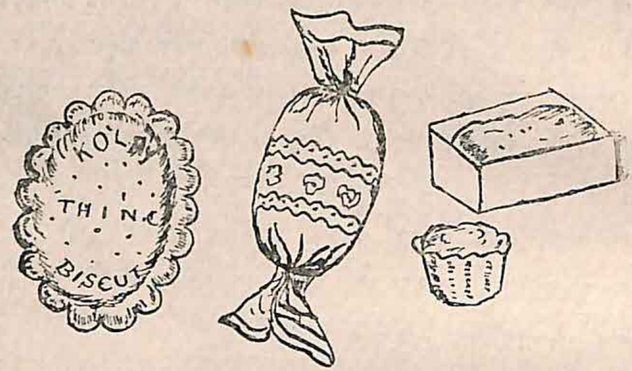
আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানা রকমের মাদুর তৈয়ার হয়। ইহার মধ্যে মেদিনীপুরের মাদুর উৎকৃষ্ট। মেদিনীপুর জিলার সবং ও পিংলা হইতে যে সকল মাদুর আসে সেগুলি দেখিতে খুবই সুন্দর। বাজারে এই জাতীয় মাদুরের চাহিদাও প্রচুর।

সুতরাং অল্প শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া যে কোন ব্যক্তি মাদুর প্রস্তুত করিতে পারে। মাদুর শিল্প একটি লাভজনক ব্যবসায় বা বৃত্তি।

উপকরণাদি ঃ—মাদুর প্রস্তুত করিতে মাদুর কাঠি বা বেতী, পাটের সূতলী দড়ি, সছিদ্র লম্বা তক্তা, দা, ছুরি, বাঁশের লাঠি, ছোট চৌকি (বসিবার জন্য) প্রভৃতি দরকার হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কনফেক্সনারী

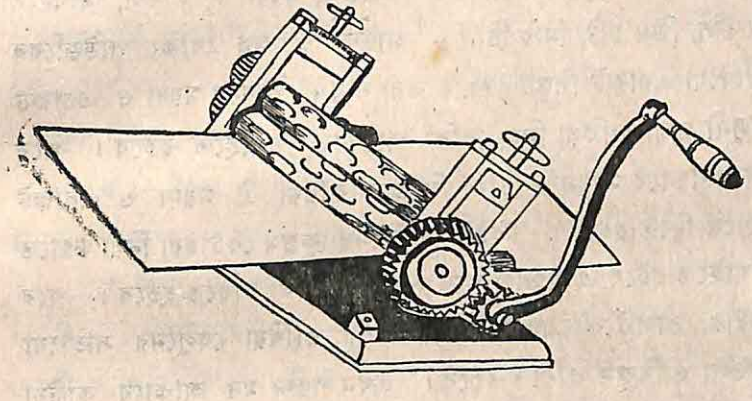


লজেঞ্জ, টফী, বিস্কুট ইত্যাদি প্রস্তুত প্রণালী

লজেঞ্জ, টফী, চকোলেট, বিস্কুট, পাউরুটি, কেক ইত্যাদি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু। বর্তমান কালে এই সমস্ত জিনিসের প্রচুর চাহিদা হইয়াছে। সামান্য শ্রম ও মূলধনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের লজেঞ্জ, টফী, বিস্কুট ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বহুলোক জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। শহরাঞ্চলে এই কাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিলাভ করিতেছে।

ষ্ট্রবেরী লজেঞ্জ ঃ—একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আড়াই কেজি জল দিয়া উনানে বসাইতে হইবে। ভাল গরম হইলে তাহাতে আড়াই কেজি চিনি ঢালিয়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে হাতা দ্বারা নাড়িয়া দিতে হইবে। চিনি জলের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেলে ৭৫০ গ্রাম গ্লুকোজ দিয়া ফুটাইতে হয়। ফুটিবার সময় বুদ্ বুদ্ উঠিবে। ঐ বুদবুদ একেবারে দূরীভূত হইলে উনান হইতে নামাইতে হইবে।

তারপর অল্প জলে কারমাইন রং ১ আউন্স ও ষ্ট্রবেরী এসেন্স পরিমাণ মত গুলিয়া লইয়া বড় হাতার দ্বারা উহাতে মিশাইতে হইবে। অবশেষে ছাঁচে ঢালিয়া টেবিলের উপর রাখিতে হইবে। যখন লজেঞ্জ ঠাণ্ডা ও শক্ত হইবে তখন টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া টিনের কৌটার মধ্যে রাখিতে হইবে। আজকাল অল্প মূল্যে লজেঞ্জ তৈয়ার



লজেন্স তৈরীর মেশিন

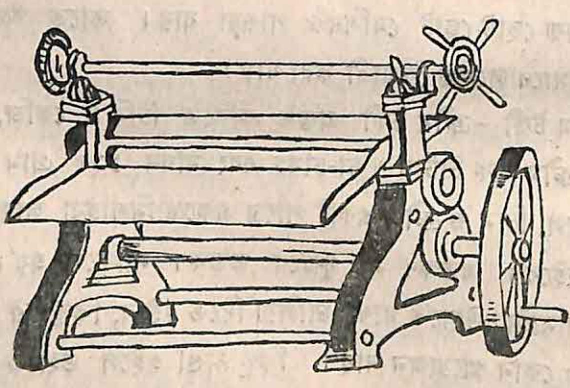
করার জন্য ছোট ছোট মেশিনও পাওয়া যায়। তাতে অল্প সময়ে বহু পরিমাণে লজেঞ্জ তৈয়ারী করা যায়।

ক্রীম টফী—ক্রীম টফী প্রস্তুত করিতে চিনি ৪ কেজি, জল ১ কেজী, ক্রীম অফ টার্টার ১ চা-চামচ এবং মাখন ১২৫ গ্রাম দরকার হয়। জল, চিনি ও ক্রীম একটি পাত্রে একত্রে মিশাইয়া আগুনে জ্বাল দিতে হইবে। যতক্ষণ না ফুটিবে ততক্ষণ নাড়িতে হয়। উনান হইতে নামাইয়া উহাতে মাখন ঢালিয়া দিতে হইবে, কিন্তু ঐ অবস্থায় নাড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। কিছু ঠাণ্ডা হইলে উহাতে পরিমাণ মত এসেন্স অফ ভ্যানিলা মিশাইতে হইবে তারপর ওয়াক্স পেপার দ্বারা মুড়িয়া দিতে হইবে।

চকোলেট ঃ—চকোলেট প্রস্তুত করিতে কোকো পাউডার ৩ পাউণ্ড, চিনি ৭ পাউণ্ড, মিল্ক পাউডার ৪ পাউণ্ড ও পরিমাণ মত

ভ্যানিলার প্রয়োজন হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি (গন্ধদ্রব্য ব্যতীত) ২ কেজি জলে গুলিয়া আগুনে ফুটাইতে হইবে। এইভাবে ফুটিয়া পেষ্টে পরিণত হইলে কোন সমতল পাত্রে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া নিতে হইবে এবং উহাতে নাম ছাপিতে হইবে। উনান হইতে নামাইবার পর ঠাণ্ডা হইলে গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

এরারুট বিস্কুট ঃ—এরারুট ৭ আউন্স, ময়দা ৭ আউন্স, মাখন ৩ আউন্স, ডিম ৪টি, মিহি চিনি ৮ আউন্স ও অল্প বেকিং পাউডারের সাহায্যে এরারুট বিস্কুট তৈয়ার করা যায়। প্রথমে ময়দা ও এরারুট চালুনী দ্বারা ছাকিয়া নিয়া বেকিং পাউডার মিশাইতে হইবে। পরে আলাদাভাবে মাখন ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ঐ ময়দা ও এরারুট উহাতে দিতে হইবে। ইহার পর ডিমের কুসুম ফেটাইয়া নিয়া উহাতে মিশাইতে হইবে এবং ভালভাবে সবগুলি মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে ময়দার তালটিকে একটি টিনের উপর রাখিয়া বেলুনের সাহায্যে পাতলা ও বিস্তৃত করিতে হইবে। এখন পছন্দ মত আকারে কাটিয়া নিয়া নাম ছাপ দিতে হইবে। ঐ টিনের পাতে করিয়া কাঁচা কিস্কুটগুলি



বিস্কুট রোলিং মেশিন

বড় উনানের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। বিস্কুটের রং বাদামী হইলে বুঝিতে হইবে যে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়াছে। বিস্কুটগুলি কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হইলে পর টিনের কৌটায় তুলিয়া রাখিতে হয়।

বর্ত্তমানে অল্প মূল্যে বেশী পরিমাণে বিস্কুট তৈরীর জন্য আধুনিক বিস্কুট রোলিং মেশিন পাওয়া যায়। (৩০ পৃঃ চিত্র দেখ)

কন্‌ডেন্স মিল্ক ঃ—আজকাল কনডেন্স মিল্কের চাহিদা বাড়িয়াছে। দুধের অভাবের জন্য অনেকেই কনডেন্স মিল্ক ব্যবহার করিয়া থাকে। ৫ কেজি গরম দুধে ১ কেজি চিনি দ্রবীভূত করিয়া ভ্যাকুয়াম প্যানে বাষ্পের দ্বারা ফুটাইতে হইবে। ১২০ ডিগ্রি হইতে ১৮০ ডিগ্রি উত্তাপে ফুটাইলে প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে দুধ জমিয়া যায়। এইভাবেই কনডেন্স মিল্ক প্রস্তুত করা হয়।

কেক ঃ—কেক সকলের নিকটই প্রিয়। অধুনা ভদ্র সমাজে ইহার ব্যবহারও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২৫০ গ্রাম ময়দা, ২৫০ গ্রাম চিনি, ৪টি ডিম, ১ চামচ বেকিং পাউডার, ৬০ গ্রাম কিস্‌মিস্ ও কিছু পেস্তা-বাদামের সাহায্যে কেক প্রস্তুত করা যায়। একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে কিছু মাখন মাখাইয়া এক টুকরা সাদা কাগজে পাত্রটির ভিতর অংশ ঢাকিয়া দিতে হইবে। অন্য একটি পাত্রে ডিম ভালভাবে ফেটাইয়া নিতে হইবে। এইবার ঐ ডিমে ময়দা, বেকিং পাউডার ও চিনি দিয়া ফেটাইতে হইবে এবং পূর্বের কাগজ পাতা পাত্রে ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর কিস্‌মিস্ ও কুচি কুচি পেস্তা বাদাম ইত্যাদি ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার পর পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এখন ঐ পাত্রটিকে অল্প আঁচে ওয়াটার বাথে বসাইয়া রাখিতে হইবে। পিছুক্ষণ পরে পাত্রের ঢাকনি খুলিলে দেখা যাইবে যে কেক ফুলিয়া উঠিয়াছে। তখন ঐ পাত্র হইতে কেক নামাইয়া অন্যপাত্রে রাখিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল সংরক্ষণ



ফলের খাদ্যমূল্য বজায় রাখিয়া উহাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চয় করাকেই ফল-সংরক্ষণ বলে। ফল একটি পুষ্টিকর খাদ্য। সুতরাং ফল-সংরক্ষণের উপর আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আদিমযুগে মানুষ বন হইতে ফল-মূল সংগ্রহ করিয়া আনিত। কোনদিন তাহাদের মিলিত, কোনদিন মিলিত না। বাঁচিয়া থাকাই ছিল তাহাদের কাছে একটি বিড়ম্বনা। কৃষি আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিল। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সে শিখিল।

কিন্তু পাত্রে পুরিয়া সংরক্ষণের পদ্ধতি খুব বেশী দিন চালু হয় নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলাস এপার্ট নামক এক বৈজ্ঞানিক কাঁচের পাত্রে ফল সংরক্ষণ সম্ভব কিনা তাহা লইয়া পরীক্ষা চালাইতে থাকেন। তারপর লুই পাস্তুরের গবেষণার ফলে আজ সুষ্ঠুরূপে খাদ্য সংরক্ষণের কাজ সম্ভব হইতেছে।

ভবিষ্যতের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্যই ফল-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাছাড়া ফলের মধ্যে একপ্রকার জারকদ্রব্য সৃষ্টি হয়। এই জারকদ্রব্য কখনও কখনও ফলের খাদ্যগুণ নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার জন্যও ফল-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বিভিন্নভাবে ফল-সংরক্ষণ করা যায়

(ক) **নিরুত্তাপ বা শীতল পদ্ধতি** :—অধুনা আমাদের দেশে শীতল কক্ষের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। তবে ঘরোয়া সংরক্ষণের জন্য শীতল কক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব নহে। কেননা ইহা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল। শুধুমাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই শীতল কক্ষের ব্যবহার সম্ভব। নিত্য-ব্যবহার্য ফল-সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটার (তাপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র) সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

(খ) **গ্যাস** :—গ্যাসের সাহায্যে ফল-সংরক্ষণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছ হইতে তুলিয়া আনিবার পরেও ফলের মেটাবলিজম ক্রিয়া চলিতে থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিলে ফলের মেটাবলিজম ক্রিয়া স্তিমিত হয় এবং ফল পাকিতে বিলম্ব ঘটে।

(গ) **ক্যানিং** :—খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্রে পুরিয়া সংরক্ষণ করার নাম ক্যানিং। একটি বিশুদ্ধ বদ্ধ পাত্রে বায়ু ও জীবাণুর হাত হইতে ফল রক্ষা করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। ফল সংরক্ষিত করিতে কখনও কখনও সিরাপ বা চিনির জল মিশ্রিত করা হয়। তবে এসিডযুক্ত ফলে সিরাপ মিশাইতে হয় না, ফলের এসিডই সংরক্ষণে সহায়তা করে।

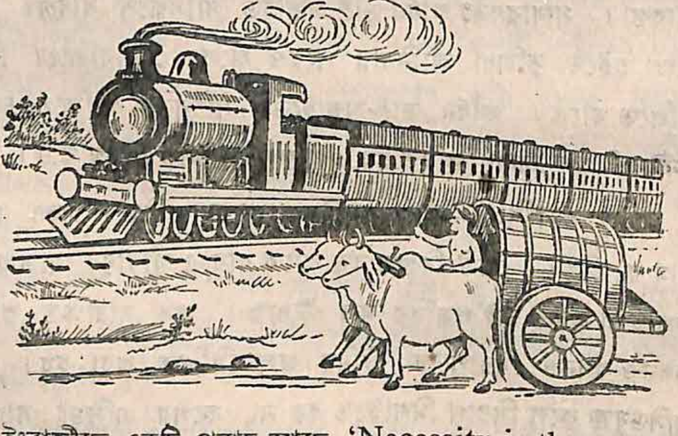
(ঘ) **শুষ্ককরণ** :—পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভের পর ফলের বৃদ্ধির সম্ভাবনা যখন তিরোহিত হয়, তখন অনিবার্য ক্ষয় ও পচনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রকৃতি উহাদের অনেককেই শুকাইয়া ফেলে

এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। খেজুর, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি জাতীয় ফল শুষ্ককরণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত করিতে হয়।

ফল-সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি হইল রৌদ্রে শুকান। আমাদের দেশের অনেক গৃহিনীরাই আম, চালতা ইত্যাদি ফল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অসময়ের জন্য তুলিয়া রাখেন। হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, কুল প্রভৃতি ফল গোটাই শুকান হয়।

সপ্তম অধ্যায়

পরিবহণ ব্যবস্থা



ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'Necessity is the mother of invention' অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তাই 'আবিষ্কারের জননী। পূর্বে দেশে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য কোনরূপ পরিবহণের ব্যবস্থা ছিল না এমন কি দূর দূরান্তেও সকলকে পদযোগেই সর্বত্র যাতায়াত করিতে হইত।

ইহাতে যেমন অমানুষিক ক্লেশও হইত তেমনি সময়ও লাগিত প্রচুর। এই প্রয়োজন বোধ হইতেই পরিবহণ ব্যবস্থার প্রথম আবিষ্কার।

পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন প্রয়োজন বোধ হইতেই এই পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতির উপর একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর।

কৃষি এবং শিল্পোৎপাদিত খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী একস্থান হইতে অন্য স্থানে দেশ হইতে দেশান্তরে আদান-প্রদান করিতে না পারিলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ে, এবং এই অচলাবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব।

অতএব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে সেই দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি অবশ্যই করিতে হইবে।

শহরে ও গ্রামের পরিবহণ বা যানবাহন ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার হয়। শ্রেণীগতভাবে ইহাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— স্থলযান, জলযান এবং আকাশ যান। নিম্নে শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ—শহরাঞ্চলে স্থলযানের মধ্যে লরি, বাস, টেম্পু, হাতটানা বা সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি।



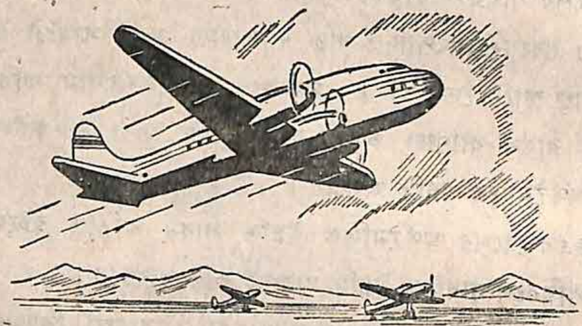


ইহা ব্যতীত রেলপথ শহরাঞ্চলের একটি প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থা। শহরগুলি হইতে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত প্রত্যহ এই রেলপথে যাতায়াত করে। বর্তমানে শহরের লোকসংখ্যা

ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার দরুণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শহরের মধ্যেই ভূগর্ভস্থিত আরও কয়েকটি রেলপথ প্রবর্তন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'পাতাল রেলপথ'।

জলপথে লঞ্চ ও ষ্টীমার পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবহণের জন্য বিমান পথকে বিশেষ কাজে লাগানো হইয়াছে। তবে এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র



বড় শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলিয়া দেশে ধনী সম্প্রদায়ই সচরাচর এই পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন।

গ্রামাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা :—যে গ্রামের পথ পাকা সেখানে সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু যে



গ্রামের পথ কাঁচা সেইস্থানে নৌকা, গো-শকট ইত্যাদি একমাত্র পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ বৃত্তি-শিক্ষা

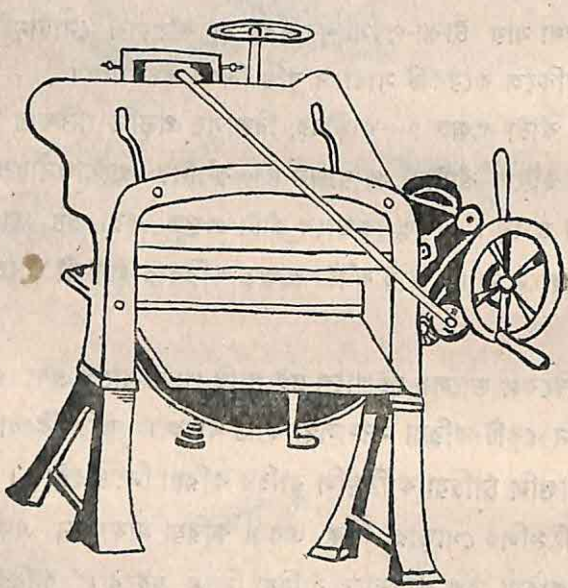
ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিদ্যালয়-জীবন হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি শিক্ষা পাওয়া উচিত। এই নিমিত্ত তাহারা সহজেই শিক্ষা করিতে পারে এমন কয়েকটি বৃত্তির বিবরণ নীচে দেওয়া হইল। মানুষের রুচি বা ভাল লাগার উপর তাহার জীবিকা বৃত্তি নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় টাকা-পয়সা খুব খরচ না করিয়াও মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান থাকিলে কয়েকটি সাধারণ বৃত্তি শিক্ষা করা যায়।

ক) ঝাটা প্রস্তুত ঃ—বাড়ীঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে ঝাটার প্রয়োজন। ঝাঁটার প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই জানে। কিন্তু কিভাবে ঝাটা প্রস্তুত করা হয় তাহা হয়ত সকলে জানে না। তাই ঝাঁটা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নীচে দেওয়া হইল।

নারিকেল ডালের দুইপাশে দুই সারি পাতা থাকে এবং এইগুলির মাঝখানে একটি করিয়া সরু লম্বা কাঠি থাকে। ছুরি কিংবা দা দিয়া ঐ পাতাগুলি চাঁচিয়া কাঠিগুলি বাহির করিয়া নিতে হইবে। তারপর এই কাঠিগুলির গোড়ার দিক একত্র করিয়া মাঝখানে একটি ছোট গোঁজ ঢুকাইয়া বেশ শক্তভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে। বাঁধিবার সময় শক্ত দড়ি, লোহার তার বা বেত দিয়া বাঁধিলেই ভাল মজবুত ঝাটা প্রস্তুত হয়।

খেজুর গাছের পাতা দিয়াও ঝাটা প্রস্তুত করা যায়। পাতাগুলি চিরিয়া নিয়া একত্রে বাঁধিয়া দিলেই ঝাটা প্রস্তুত হয়। তবে নারিকেল গাছের ঝাটার মত এত ভাল হয় না।

খ) পেপার কাটিং ঃ—বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর সময়ে হাতের কাজও শিখিতে পারে। এই সমস্ত হাতের কাজের মধ্যে পেপার কাটিং অন্যতম। বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা, স্বাধীনতা-দিবস উৎসব কিংবা অন্যান্য-অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কিংবা বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কাগজের ফুল, মালা, পাতা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া থাকে। এই জিনিস প্রস্তুত করিতে তাহাদের মধ্যে খুবই আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। এইসব জিনিস প্রস্তুত করিয়া তাহারা বেশ আনন্দ লাভ করে। সুতরাং ভবিষ্যতের পক্ষে এই সৃজনী-শক্তির মূল্যও কম নহে। কাগজ কাটিয়া বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুতের



মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের রুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াশুনার অবসরে বিভিন্ন রংয়ের কাগজের দ্বারা তাহারা অনায়াসেই নানা জিনিস তৈয়ার করিতে পারে। এই কাজে সাধারণতঃ কাঁচি, নানা রংয়ের কাগজ ও ড্রয়িং বইয়ের দরকার হয়। কাগজ হাতে কাটিতে অনেক সময় লাগে। তাই আধুনিককালে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ কাগজ কাটিবার জন্য

এক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্রকে কাগজ কাটা যন্ত্র বলে।

(ঘ) জামা-কাপড় ধৌত করণ ঃ—নিজের কাজ নিজে করা উচিত—এই শিক্ষা ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় জীবন হইতেই দেওয়া উচিত। আজকাল অনেকেই জামা-কাপড় লণ্ড্রীতে কিংবা ধোপার বাড়ীতে না পাঠাইয়া নিজেরাই বাড়ীতে ধৌত করিয়া নেয়। ইহাতে খরচও বাঁচে, অন্যদিকে স্বাবলম্বন শিক্ষাও হয়। ছুটির দিনে বিশেষ করিয়া রবিবার দিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত নিজেদের জামা-কাপড় বাড়ীতে ধৌত করিয়া নেওয়া। বাড়ীর অভিভাবকদেরও তাহাদের ছেলেমেয়েদের উপর এই কাজের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

ইহার ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা স্বাবলম্বী হইবে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। গো-পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। বিভিন্ন শ্রেণীর গরু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। একটি আদর্শ গো-শালার বর্ণনা দাও।

৪। গো-পালনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩। মহিষ, মেষ ও শূকর পালনের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলী উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। মুর্গী পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। বিভিন্ন শ্রেণীর মুর্গীর বর্ণনা দাও।

৩। মুর্গী কিভাবে পালন করিবে লিখ।

৪। মুর্গী ও ইহার বাঁচ্চার খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

১ মৌমাছি পালনের আবশ্যকতা বর্ণনা কর।

২। মৌমাছি কিভাবে পালন করিবে।

৩। মৌ-বাক্সের একটি বিবরণ দাও।

৪। মধু নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। মাদুর প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। মাদুর প্রস্তুত করিতে কি কি উপকরণ দরকার হয় ?

৩। মাদুর প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ষ্ট্রবেরী লজেঞ্জ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।

২। ক্রীমটফী ও চকোলেট কিভাবে প্রস্তুত করিবে ?

৩। এরারুট বিস্কুট তৈয়ার করিতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয় এবং কোন্ জিনিস কি পরিমাণ লাগে লিখ।

৪। এক্সমাস কেক কোন্ কোন্ উপকরণ দিয়া প্রস্তুত হয় এবং কিভাবে প্রস্তুত হয় লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ফল-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। কোন্ কোন্ উপায়ে ফল সংরক্ষণ করিবে ?

সপ্তম অধ্যায়

১। গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের কি কি ব্যবস্থা আছে ?

২। শহরাঞ্চলে পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যম বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। ভবিষ্যত জীবনের জন্য কয়েকটি সাধারণ বৃত্তির নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

শারীরিক শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

ব্যায়াম ও ইহার নিয়মাবলী

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে সকলেরই নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যায়াম একান্ত দরকার। কোন্ সময়ে কি ধরণের ব্যায়াম করিবে, ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, সবই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন ব্যায়ামের নিয়মাবলীও তাহাদের জানা উচিত।

আমরা প্রতিদিন নানা রকম খাদ্য খাই। কিন্তু খাইলেই শরীরে পুষ্টি সাধন হয় না। সেই খাদ্যগুলিকে হজম করা প্রয়োজন। নিয়মিত শরীর চর্চা করিলেই সেই খাদ্যগুলি হজম করা যায় এবং ইহার ফলে শরীর সুস্থ থাকে। ডন, বৈঠক, সাঁতার, যোগাসন প্রভৃতি অনেক রকমের ব্যায়াম আছে। ফুটবল খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, ক্রিকেট খেলা, প্রভৃতি খেলাধূলাও ব্যায়াম। বিভিন্ন ঋতু, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ধরণের ব্যায়াম করিয়া থাকে। ব্যায়ামের ফলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকমত সঞ্চালিত ও গঠিত হয়। শরীরের ভিতরের ময়লা ঘামের আকারে বাহির হইয়া যায়। শরীরের রক্ত ঠিকমত সঞ্চালিত হয়। ইহাতে শরীর নীরোগ থাকে। ব্যায়াম করিলে ছেলেমেয়েদের শরীর সবল ও দৃঢ় হয়। ইহাতে তাহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন ও শরীরকে আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন ধরণের ব্যায়াম বা শরীর-চর্চা শিক্ষা করা উচিত।

ব্যায়াম বা শরীর চর্চার কয়েকটি সাধারণ নিয়ম :—

১। সাধারণতঃ প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং বিকাল বেলা ব্যায়াম বা শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়।

২। রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে ব্যায়াম করা উচিত নহে।

৩। অতিরিক্ত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে অপকারী।

৪। অসুস্থ লোকের ব্যায়াম করা মোটেই উচিত নহে।

৫। খালিপেটে ব্যায়াম করা উচিত নহে।

৬। ব্যায়ামের পূর্বে সামান্য কিছু খাইতে হইবে।

৭। ব্যায়ামের পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার।

৮। ব্যায়ামের ঠিক পরেই কিছু খাওয়া কিংবা জলপান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

৯। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুষ্টিকর খাদ্য পরিমিত ভাবে খাইতে হইবে।

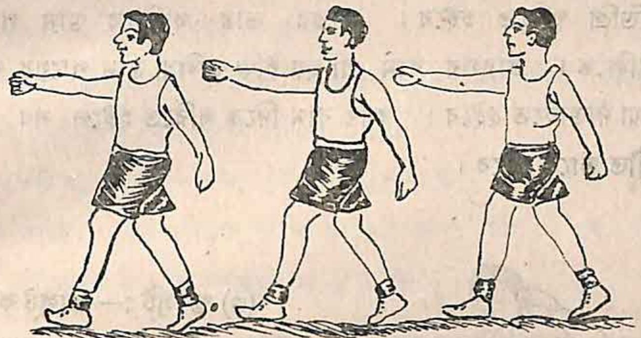
১০। ব্যায়ামের সময় নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলা সকলেরই কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খালি হাতে ব্যায়াম

শরীর পালনের জন্য ব্যায়াম অতি আবশ্যক। শক্তি ও সৌন্দর্য লাভের জন্য যে ব্যায়াম তাহাকে খালি হাতে ব্যায়াম বলা হয়। খালি হাতে ব্যায়ামকে ইংরাজীতে ক্যালিস্থেনিক্স বলে। খালি হাতে ব্যায়ামের সাহায্যে দেহ পুষ্ট হয়, মাংসপেশী সুন্দর ভাবে গঠিত হয় এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ডন, বৈঠক, ড্রিল, প্রভৃতি খালি হাতে ব্যায়ামের কয়েকটি উদাহরণ। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই সকল কয়েকটি ব্যায়ামের বিবরণ ও নিয়মাবলী দেওয়া হইল।

ড্রিল মার্চিং—প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ড্রিল মার্চিং-এর একটি আলাদা পিরিয়ড থাকা দরকার। ক্রীড়া শিক্ষক ঐ পিরিয়ডে বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রিল মার্চিং করাইবেন। শিক্ষক



মহাশয় কয়েকটি কম্যাণ্ড বা নির্দেশ করিলে ছাত্র-ছাত্রীরা সেই কম্যাণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মার্চ করিবে।

(ক) **বসিয়া যাও**:—এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছাত্রেরা এমনভাবে বসিয়া পড়িবে যে ডান পায়ের গোড়ালি বাম দিকে এবং বাম পায়ের গোড়ালি ডান দিকে আসিবে এবং হাত দুইটি দুই হাটুর উপরে থাকিবে। সমস্ত দেহ সোজা থাকিবে এবং সম্মুখের দিকে তাকাইতে হইবে।



(খ) **দাঁড়াইয়া পড়**:—এই নির্দেশ হওয়া মাত্র ছাত্রেরা একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিবে।

(গ) **দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিছনে ঘোর**:—(এক) এইবার বাম পায়ের পাতার সম্মুখে এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর করিয়া ডান দিক দিয়া ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়া যাইতে হইবে। (দুই) এখন বাম পা ছয় ইঞ্চি উঁচু করিয়া ডান পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

(ঘ) **ডানে বা বামে ঘোর**ঃ—দুই দিকেই ঘুরিতে গেলে হাঁটু সোজা রাখিতে হইবে। ডান দিকে গেলে শরীর সোজা রাখিয়া বাম পায়ের পাতায় সম্মুখে এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে ভর করিয়া ৯০ ডিগ্রি ঘুরিতে হইবে। দেহের ভার থাকিবে ডান পায়ের গোড়ালিতে। তারপর বাম পা ছয় ইঞ্চি তুলিয়া ডান পায়ের কাছে আনিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আর বাম দিকে ঘুরিতে হইলে সব কাজ বিপরীত ভাবে হইবে।



(ঙ) **স্যালুট**ঃ—স্যালুট করিতে হইলে ডান হাত বৃত্তাকারে মাথার কাছে আনিতে হইবে। হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে তখন কোন ফাঁক থাকিবে না। ডান হাতের কব্জি ও কাঁধ সোজা ডান দিকে রাখিতে হইবে। বৃদ্ধ আঙ্গুল ডান চক্ষু হইতে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে থাকিবে।

(চ) **এক লাইনে দাঁড়াও**ঃ—এই নির্দেশ পাওয়ামাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের একই লাইনে দাঁড়াইতে হইবে। প্রত্যেকের দূরত্ব হইবে এক কাঁধ। এইবার ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা গুনিতে বলিলে তাহারা এক-দুই-তিন—এইভাবে গোনা আরম্ভ করিবে।

(ছ) **ধীরে চল**ঃ—এই নির্দেশ হওয়া মাত্র বাম পা বাড়াইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আগাইয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেকের দেহ সোজা থাকিবে। হাত দুইটি থাকিবে শরীরের দুই দিকে। এক একটি পদক্ষেপ হইবে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার। 'এক' বলিলে বাম পা মাটিতে পড়িবে

এবং 'দুই' বলিলে ডান পা মাটিতে পড়িবে। এইভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে। এই অবস্থায় হঠাৎ 'সাবধান' বলিলে তাহাদিগকে থামিয়া যাইতে হইবে। 'আগে চল' এই নির্দেশ দিলে সকলকেই তালে তালে আগাইয়া যাইতে হইবে।

এইরূপ বহু রকমের ড্রিল-মার্চিং আছে। ক্রীড়া-শিক্ষক ছাত্রদের এইগুলি শিখাইলে বেশ সুফল পাওয়া যাইবে।

স্বদেশী ব্যায়াম ঃ—ডন, বৈঠক, সূর্য-নমস্কার প্রভৃতিকে স্বদেশী ব্যায়াম বলে। এই ব্যায়াম খালি হাতেই করা যায়। যে কোন লোক এই সকল ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারে।

মেয়েদের কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়াম ঃ—

১নং ব্যায়াম



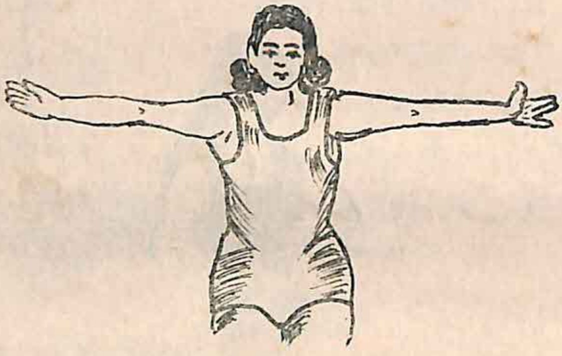
১ নং চিত্রের মত দুইহাত কোমরে রাখিয়া এবং পা দুইটি প্রায় এক হাত ফাঁক করিয়া দাঁড়াও।

এইবার দম লইতে লইতে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত বাম দিকে বাঁকাইয়া লও। এইবার দম ছাড়িতে ছাড়িতে কোমর হইতে উপরের শরীর সম্মুখে আনিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও।

এইভাবে দম লইতে লইতে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত ডান দিকে বাঁকাও। পরে দম ছাড়িতে ছাড়িতে পূর্বের মত কোমর হইতে শরীর সম্মুখে আনিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও।

এইব্যায়াম প্রতিদিনে ৮ বার করিয়া উভয় দিকে ১৬বার অভ্যাস করিলে একটি ভাল ব্যায়াম হয়। ইহার ফলে মেরুদণ্ড দৃঢ় অথচ নমনীয় হয়। কোমরের দিকে চর্বি জমিতে পারে না।

২নং ব্যায়াম

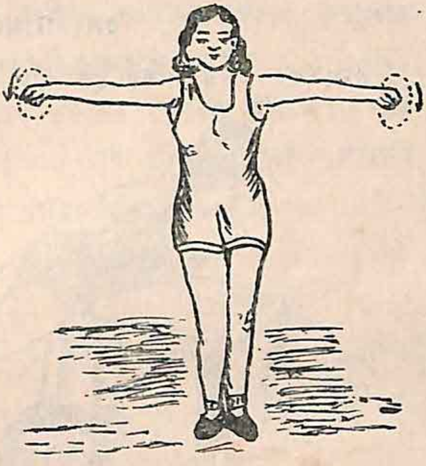


দুই হাত কাঁধের সোজা সম্মুখে তুলিয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও।

এইবার দম লইতে লইতে দুইহাত শরীরের দুইপাশে কাঁধের সোজা ছড়াইয়া দাও। পরে দম ছাড়িতে ছাড়িতে দুই হাত কাঁধের সোজা সম্মুখে আন। হাত যাহাতে কনুয়ের কাছে না ভাঙ্গে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই ব্যায়াম দৈনিক ১৬ বার অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর। ইহার ফলে শ্বাস যন্ত্র সবল হয় এবং বুকের গঠন খুব সুন্দর হয়।



৩নং চিত্র



৪নং চিত্র

৩নং ব্যায়াম

৩নং চিত্রের মত দুই হাত শরীরের দুইপাশে রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। এইবার দম লইতে লইতে দুই হাত শরীরের দুই পাশ দিয়া টান করিয়া (চিত্রের ন্যায়) মাথার উপরে তোল। এইবার দম ছাড়িতে ছাড়িতে দুই হাত নামাও। এই ব্যায়াম দৈনিক ১৬ বার অভ্যাস করিবে। ইহার ফলেও শ্বাসযন্ত্র সবল হয় এবং বুকের গঠন সুন্দর হয়।

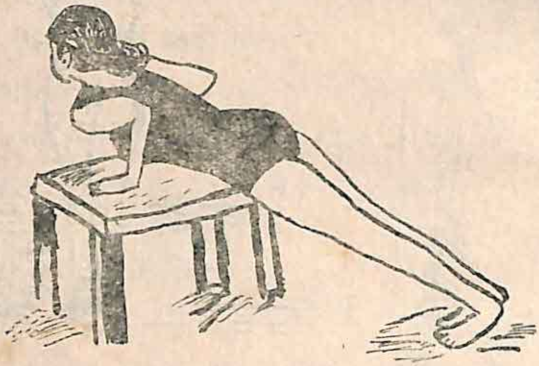
৪নং ব্যায়াম

৪নং চিত্রে দেখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। দুই হাত দুই পাশের কাঁধের সোজা তোল। এখন দম লইতে লইতে দুই হাত কনুই হইতে এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দুই হাতের আঙ্গুল যথাক্রমে দুই কাঁধের কাছে আন এবং দম ছাড়িতে ছাড়িতে হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া কাঁধের সোজা

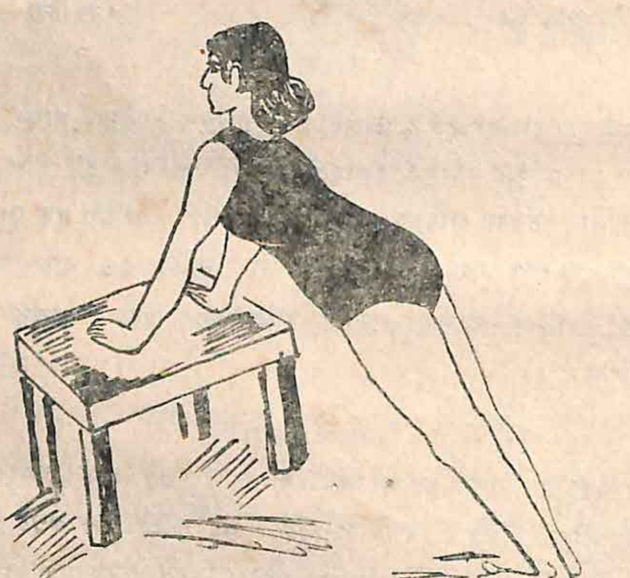
রাখ। এই ব্যায়াম দৈনিক ১৬ বার অভ্যাস কর। ইহাতে হাতের গড়ন সুন্দর হয়।

৫নং ব্যায়াম

৫নং (ক) চিত্র দেখিয়া দুই হাত কনুয়ের কাছে ভাঙ্গিয়া একটি



৫ (ক) চিত্র



টুল বা টেবিলের উপর ছবির ভঙ্গিমার মত সম্পূর্ণ দেহটিকে রাখ।

এইবার দম লইতে লইতে দুই হাতের জোরে দুইহাত কনুইয়ের কাছ হইতে সোজা করিয়া দুই হাতের উপর দেহ তুলিয়া ৫নং (খ) ছবির ভঙ্গিমায় আন। তারপর দম ছাড়িতে ছাড়িতে দুইহাত কনুইয়ের কাছে ভাঙ্গিয়া দেহ নীচে নামাইয়া ছবির ভঙ্গিমায় আন।

এই ব্যায়াম প্রথম অবস্থায় ৬।৭ বার অভ্যাস করিবে। পরে আস্তে আস্তে সংখ্যা বাড়াইয়া ১৫।১৬ বার করিবে। এই ব্যায়ামের ফলে হাতের গঠন সুন্দর হয় এবং দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬নং ব্যায়াম



৬নং চিত্র দেখিয়া পায়ের পাতা ছয় ইঞ্চি ফাঁক করিয়া দুইহাত কোমরে রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। এইবার দম ছাড়িতে ছাড়িতে গোড়ালি তুলিয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া ছবির

মত গোড়ালির উপর বস। কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত সম্মুখে ঝুঁকিয়া না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইবার দম লইতে লইতে গোড়ালি নামাইয়া দেহের ভার সমানভাবে দুই পায়ের পাতার উপর রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও।

এই ব্যায়ামে প্রথমে ৭ বার করিয়া ২ বারে ১৪ বার অভ্যাস কর। পরে অভ্যাস বৃদ্ধি করিয়া ২৫ বার করিয়া ২ বারে ৫০ বার করিবে। এই ব্যায়ামের ফলে পায়ের গড়ন সুন্দর হয় এবং পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ ব্যায়াম

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা যোগ অভ্যাস করিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতেন। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে যোগ ব্যায়ামের অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম আর নাই।

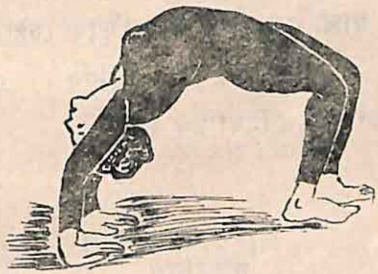
এই ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। যোগ ব্যায়ামে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কাজে কর্মে ইচ্ছা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যায়ামের ফলে অনেক রোগ নিবারণ করা যায়। যোগ ব্যায়াম রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিভিন্ন রকমের যোগ ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। পরে তাহাদের সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

চক্রাসন

[ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

প্রথমে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। এইবার দুইহাত কনুয়ের কাছে ভাঙিয়া হাতের পাতা দুই কাঁধের কাছে মেঝেতে রাখ এবং একই সঙ্গে দুই পা হাঁটুর কাছে ভাঙ্গিয়া গোড়ালি সামান্য ফাঁক করিয়া নিতম্বের নিকট আনিতে চেষ্টা কর। তারপর হাত ও পায়ের উপর জোর দিয়া কোমর,



পিঠ ও মাথা তোল। এখন চিত্রের ন্যায় হাত ও পা যতদূর সম্ভব প্রসারিত কর এবং সোজা কর। এইবার মাথা সাধ্যমত পিছন দিকে বাঁকাইয়া চক্রের আকার ধারণ করিতে চেষ্টা কর।

এই আসন ১০ হইতে ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত করিবে। ইহার ফলে মানুষের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই আসনের ফলে মেরুদণ্ড সবল হয় এবং বুকের গঠন ভাল হয়।

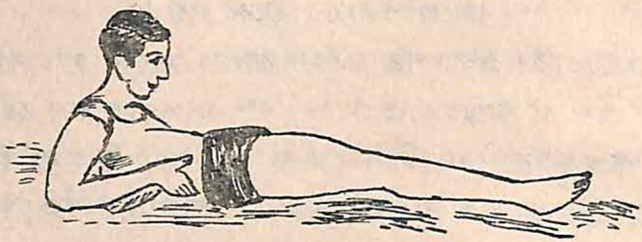
এই আসন ১০ হইতে ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত করিবে। ইহার ফলে মানুষের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই আসনের ফলে মেরুদণ্ড সবল হয় এবং বুকের গঠন ভাল হয়।

সর্বাঙ্গাসন

[সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

এই আসন এক প্রকার মুদ্রা। প্রথমে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। চিত্রের ন্যায় পা দুইটি উপরে তোল। দুইহাত কটি ও পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে

কোমরে ঠেকা দিয়া দম লইতে লইতে বুক, কোমর ও নিতম্ব উপরে



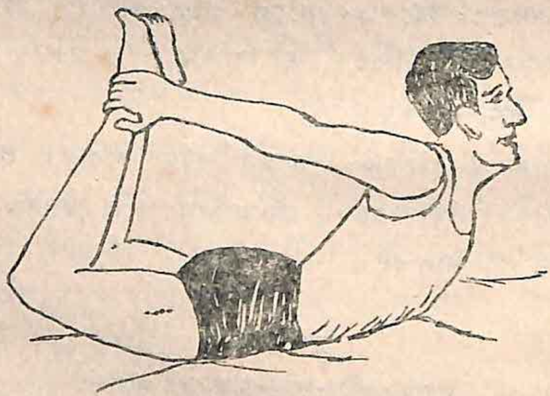
তোল। এইবার স্বাভাবিক ভাবে দম ছাড়িতে চেষ্টা কর।

এই আসন ১২ সেকেণ্ডের মত করিবে। এই আসন অভ্যাস করিলে সকল প্রকার রোগ নিবারিত হয়।

ধনুরাসন

[অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

এই আসনে দেহ ধনুকের আকার ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ধনুরাসন।



প্রথমে উপুর হইয়া শুইয়া পড়। এইবার পা দুইটি হাঁটুর কাছে ভাঙ্গিয়া পিঠের কাছে আন এবং দুইহাত দিয়া গোড়ালী শক্ত করিয়া

ধর। হাঁটুকে ১০।১২ ইঞ্চি ফাঁক কর। এখন হাত দিয়া গোড়ালী টান। তলপেট ভূমিতে রাখিয়া বুক ও হাঁটু যতদূর সম্ভব মাটি হইতে উপরে তুলিয়া পিছন দিকে ধনুকের মত বাঁকাও।

এই আসন প্রায় ৬০ সেকেণ্ড পর্যন্ত করিবে। এই আসনের ফলে কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর হয়, যকৃতের কাজ ভাল হয়। কোমর ও পেটের চর্বি এই আসনের ফলে বেশ কমিয়া যায়। ইহার ফলে বুক বিস্তৃতি লাভ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাঁতার কাটা



সাঁতার একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ভারত নদী-মাতৃক দেশ। বিশেষ করিয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর নদী, নালা, খাল, বিল, দীঘি ইত্যাদি রহিয়াছে। পল্লীগ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রায় অনেকেই সাঁতার কাটিতে জানে। শহরাঞ্চলে পুকুরের অভাবে সকলেই সাঁতার কাটিতে পারে না। তবু বর্ত্তমানে শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সাঁতার কাটার প্রবণতা দেখা দিয়াছে।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তঃ স্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়। জাপান আন্তঃ স্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তক। পৃথিবীর বৃহত্তম সাঁতার পুল মরোক্কোর কাসাব্লাঙ্কায়। কিন্তু সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য বৃহত্তম পুল জাপানের ওসাকা শহরে। দূর পাল্লার সাঁতারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সবার উপরে। সাঁতারে বাংলার প্রফুল্ল ঘোষ, মিহির সেন, আরতি সাহা ও আরও অনেকে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সাঁতার সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) ফ্রী স্টাইল, (২) ব্রেস্ট ষ্ট্রোক, (৩) বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক, (৪) ব্যাক ষ্ট্রোক।

ফ্রী ষ্টাইল :—ফ্রী ষ্টাইল সাঁতারে সাঁতারুর মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেহের পিছন অংশ জলের উপরে থাকে। সাঁতারু তাহার মাথার আগে একের পর এক দুইহাত বাড়াইয়া জল টানিতে থাকে। মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সময় তাহার মুখ দেখা যায়। হাত দিয়া জল টানিয়া এবং পা দিয়া জল কাটাইয়া সে আগাইয়া চলে।

ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক :—এই সাঁতারে দুইটি হাত একই সঙ্গে বুকের কাছ হইতে জলের মধ্যে ঠেলিতে হইবে সম্মুখের দিকে এবং জল টানিয়া দুইটি হাতে পিছনের দিকে নিতে হইবে। শুধু কাঁধ দুইটি জলের উপরে থাকে। সমস্ত দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের উপর। মোড় ঘুরিবার সময় কিংবা সমাপ্তির সময় দুইহাত স্পর্শ করে।

বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক :—সাঁতারুর হাত দুইটি এক সঙ্গে জলের উপরে সম্মুখের দিকে নিয়া পুনরায় একই সঙ্গে একইভাবে জল টানিয়া পিছনে আনিতে হয়। তাহার কাঁধ জলের উপর ভাসিয়া থাকে। সম্পূর্ণ দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের উপর। বাটার ফ্লাই সাঁতারে পা খাড়াভাবে উপর-নীচ করা যায়। সমাপ্তি রেখায় পৌছিলে সাতারু দুইহাত স্পর্শ করিতে পারে।

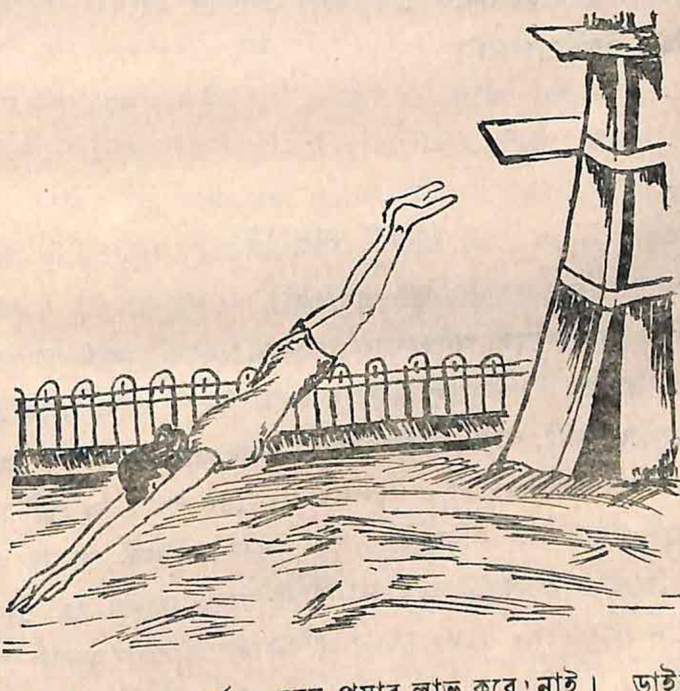
ব্যাক স্টোক :—প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাঁতারু রেখা বা স্টার্টিং এণ্ড এর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। তাহাদিগকে সারাক্ষণ পিছনে সাঁতার কাটিতে হয়।

সাঁতারের প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক :—

১। সাঁতারের দূরত্ব সীমা :—সাধারণতঃ ফ্রী-স্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দূরত্ব থাকে। ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই, ও ব্যাক স্ট্রোকে দূরত্ব হয় ১০০ এবং ২০০ মিটার।

২। সাঁতারের পুল :—সাঁতারের জন্য পুলের দরকার। ব্যাক-স্ট্রোকব্যতীত অন্য সব সাঁতার প্রতিযোগিতায় ডাইভ দিয়া সুরু করিতে হয় বলিয়া সাঁতারের জন্য পুলের দরকার হয়।

ডাইভিং :—ডাইভিং এর অর্থ ঝাঁপ দেওয়া। আমাদের



দেশে ডাইভিং এখনও পর্যন্ত তেমন প্রসার লাভ করে নাই। ডাইভিং

এর জন্য যে প্লাটফর্ম বা বোর্ড দরকার তাহা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। কলিকাতায় রবীন্দ্র সরোবরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুল, আজাদহিন্দ বাগের সুইমিং পুল প্রভৃতিতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ডাইভিং শিক্ষা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে ডাইভিং পুল না থাকার ফলে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ডাইভিং শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

ডাইভিং দুই প্রকারের—(১) স্প্রিং বোর্ড, (২) হাই বোর্ড।

স্প্রিং বোর্ড ঃ—এই ডাইভিং-এ বোর্ডগুলি প্লাট ফর্মের উপর জল হইতে ১ মিটার ও ৩ মিটার উঁচুতে থাকে। বোর্ডের দৈর্ঘ অন্ততঃ ৪ মিটার ও প্রস্থ অর্ধ মিটার হইবে।

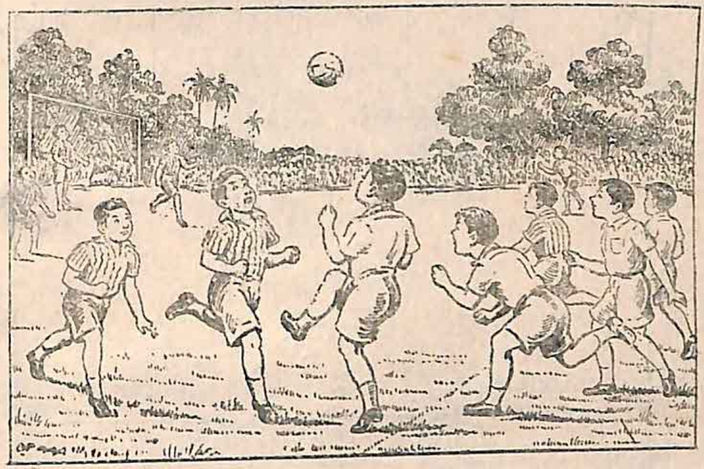
হাই বোর্ড ঃ—হাই বোর্ডের প্লাটফর্ম খুব শক্ত হওয়া উচিত। ১০ মিটার উঁচু প্লাটফর্মের দৈর্ঘ ৬ মিটারের কম হইলে চলিবে না আর ৫ মিটার উঁচু প্লাটফর্মের দৈর্ঘ ৫ মিটার হইতে হইবে। ১০ মিটার প্লাটফর্মটি বাহিরের দিকে ১'৫ মিটার প্রসারিত হইবে। প্লাটফর্মে উঠিবার জন্য সিড়ি চাই।

পঞ্চম অধ্যায়

ফুটবল খেলা

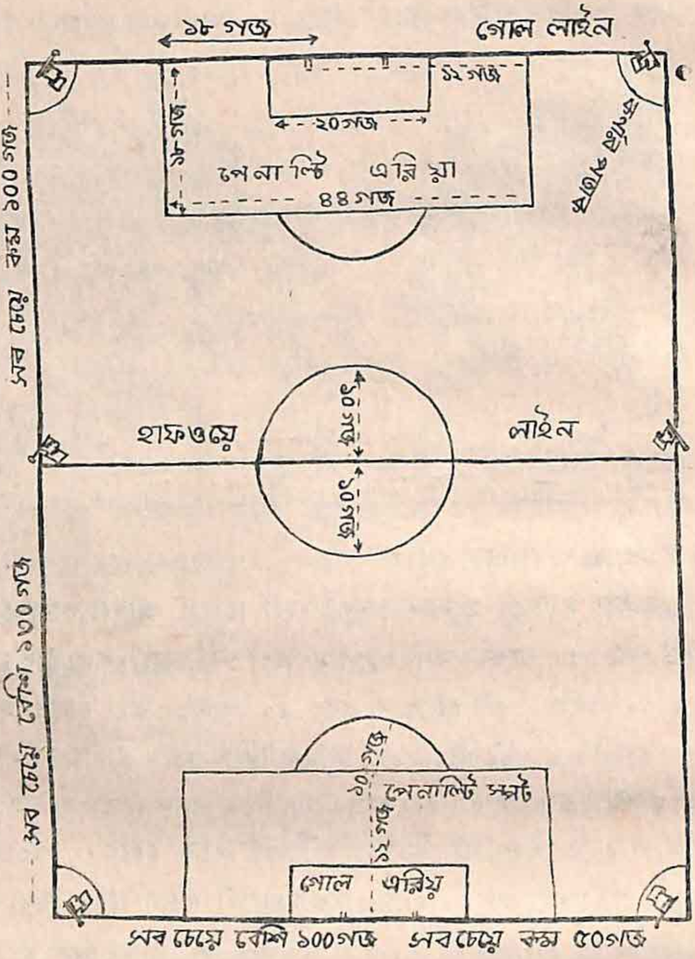
যত প্রকার খেলা আছে তাহাদের মধ্যে ফুটবল খেলাই সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়। ভারতে ইহার জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের মাঠে, পাড়ার মাঠে, ময়দানে—সব জায়গায় ফুটবল খেলা দেখাযায়। কম খরচে এই খেলা সম্ভব বলিয়া কি শহরে, কি পল্লীগ্রামে সর্বত্রই প্রসার লাভ করিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ফুটবল খেলার জন্ম চীন দেশে। • ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা আরম্ভ হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা হয়।

ফুটবল খেলার বহু নিয়ম কানুন আছে। নিম্নে এই খেলার বিভিন্ন



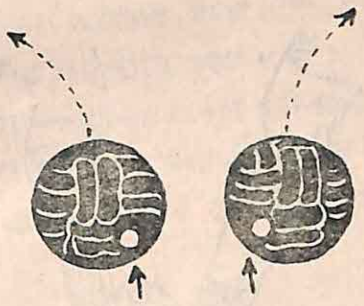
নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

খেলার মাঠ: ফুটবল খেলার মাঠ হইবে আয়তক্ষেত্রাকার। মাঠটি দৈর্ঘ ১৩০ গজের বেশী হইবে না এবং ১০০ গজের কম হইবে না। প্রস্থে ১০০ গজের বেশী হইবে না এবং ৫০ গজের কম হইবে না। মাঠের চারিদিকে স্পষ্ট সীমা রেখা টানিয়া দিতে হইবে। দীর্ঘতর সীমা রেখা দুইটিকে টাচ্ লাইন এবং ক্ষুদ্রতর দুইটিকে গোল লাইন বলা হয়। মাঠের চারি কোণে চারিটি পতাকা পুঁতিয়া দিতে হইবে। পতাকা লম্বায় ৫ ফুট হওয়া চাই। মাঠের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মধ্য রেখা বা হাফওয়ে লাইন টানিতে হইবে। মাঠের কেন্দ্র বিন্দুটি সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ১০ গজ ব্যাসার্ধ লইয়া একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে। ইহার নাম সেণ্টার সার্কল বা কেন্দ্র বৃত্ত।

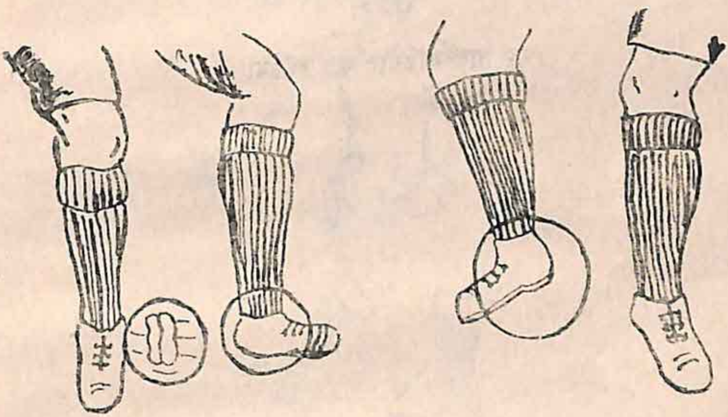


ফুটবল খেলার মাঠের ছক

গোল ক্ষেত্র :—মাঠের উভয় দিকে গোল লাইনের শেষ দুই প্রান্ত হইতে সমদূরবর্ত্তী দুইটি খুঁটি (Goal Post) লম্বাভাবে পুঁতিতে হইবে। এই খুঁটি দুইটির ভিতরের দিকে ব্যবধান হইবে ৮ গজ। খুঁটি দুইটির প্রস্থ ও গভীরতা ৫ ইঞ্চি হইবে। একই প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট আর একটি কাঠ উপর দিকে ভূমি হইতে সমান্তরাল



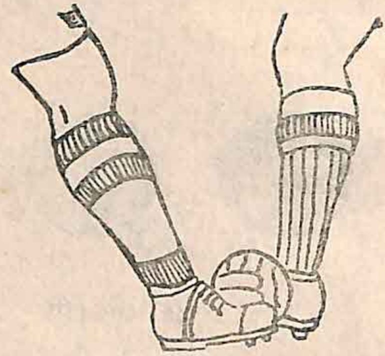
বল মারিবার পরে বলের গতি



বল মারিবার পদ্ধতি



বল চার্জ করিবার পদ্ধতি



বল চার্জ করিবার অন্য ভঙ্গিমা



বল লইয়া অগ্রসর হওয়া

ভাবে গোল খুঁটি দুইটির সংযোজক হইয়া থাকিবে। ইহাকে বলে ক্রশবার। মাঠ হইতে ইহার উচ্চতা হইবে ৮ ফুট।

পেনালটি এরিয়া—গোলের প্রত্যেক খুঁটি হইতে ১৮ গজ দূরে লাইনের উপর লম্বাভাবে ১৮ গজ লম্বা দুইটি লাইন টানিতে হইবে। এই লাইন দুইটির প্রান্ত বিন্দু দুইটির আর একটি লাইন দ্বারা যুক্ত করিয়া দিতে হইবে।



বল লইয়া অগ্রসর হওয়ার ভিন্ন রূপ

এই তিনটি লাইন এবং গোল লাইন দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানকে পেনালটি এরিয়া বলা হয়। গোলের মধ্য বিন্দু হইতে ১২ গজ দূরে পেনালটি কিক্ চিহ্ন আঁকিতে হইবে। এই চিহ্ন হইতে ১০ গজ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্তাংশ পেনালটি এরিয়া বাহিরে আঁকিতে হইবে। মাঠের উভয় দিকেই এই ব্যবস্থা থাকিবে।

কর্ণার এরিয়া—মাঠের চারিটি কোণের কৌণিক বিন্দু হইতে ১ গজ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া মাঠের ভিতরের দিকে বৃত্তাংশ আঁকিতে হইবে। এই বৃত্তাংশ পার্শ্ব লাইন ও গোল লাইন উভয়কে ছেদ করিবে।

খেলার বল—বলটি গোলাকার থাকে। বলের ভিতরের অংশ রবার নির্মিত। ইহাকে বলে ব্লাডার। আর বাহিরের অংশ চর্ম্ম নির্মিত। বায়ূ পূর্ণ বলের পরিধি হইবে ২৭ কিংবা ২৮ ইঞ্চি। ইহার ওজন ১৪ আউন্সের কম ও ১৬ আউন্সের বেশী হইবে না।

খেলোয়াড়ের সংখ্যা—প্রতি দলে ১২ জন করিয়া মোট ২২ জন খেলা করে। উভয় দলেই ২ জন খেলোয়ার রিজার্ভ রাখিতে পারে।

খেলোয়াড়ের পোষাক—রেফারীযাহাতেখেলোয়াড়দেরঠিকভাবে চিনিতে পারে সেইজন্য একটি দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই একরকমের সার্ট পরিবেন। এই সার্টকে জার্সি বলে। দুই দল একই রকমের জার্সি পরিতে পারিবেন না। খেলোয়াড়ের আন্তঃর্জাতিক বোর্ডের অনুমোদিত বিশেষ ধরণের জুতা (বুট) ব্যবহার করিতে পারেন।

লাইনস্ ম্যান ঃ—খেলার সময় সাধারণতঃ দুইজন লাইনস্ ম্যান থাকে। তাহাদের কাজ হইল বল আউট হইলে কোন্ পক্ষ বল থ্রো, গোল কিক্ বা কর্ণার কিক্ করিবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া। প্রত্যেক লাইনস্ ম্যানের হাতে একটি করিয়া পতাকা থাকে।

রেফারী ঃ—খেলাটি নিয়মানুযায়ী ও আইনসঙ্গত ভাবে যিনি পরিচালনা করেন তাঁহাকে রেফারী বলে। খেলা চলিবার সময় রেকারীর নির্দেশ সকল খেলোয়াড়কেই মানিয়া চলিতে হয়। রেফারী মাঠে প্রবেশ করা মাত্রই খেলা পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত আইন প্রয়োগ করিবার অধিকার পাইবেন। যে কোন ব্যাপারে তাঁহার নির্দেশই চুরান্ত। যে ক্ষেত্রে কোন ঘটনা রেফারীর নজরে পরিবেনাসেই ক্ষেত্রে তিনি লাইন্স ম্যানের মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যায় আচরণের জন্য রেফারী যে কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন। অপরাধ গুরুতর হইলে তিনি ঐ খেলোয়াড়কে মাঠ হইতে

বহিস্কৃত করিতে পারেন। খেলা চলিবার সময় বল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে রেফারীর অনুমতি নিতে হইবে। কোন খেলোয়াড়ের পরিবর্তে অন্য কোন রিজার্ভ খেলোয়াড় নাঠে নামিলে তাহাকেরেফারীর অনুমতি নিয়া মাঠে নামিতে হইবে। কোন খেলোয়াড় গুরুতর আঘাত পাইলে রেফারী সাময়িক ভাবে খেলা বন্ধ রাখিতে পারেন। খেলার সময় কোন বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রেফারী সেই খেলা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু কোন্ দল জিতিল সেই মত তিনি দিতে পারেন না।

খেলার সময় ঃ—খেলার প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে ৪৫ মিনিট করিয়া মোট ৯০ মিনিট খেলা চলিবে। মাঝে ৫ মিনিটের বিরতি থাকিবে। কোন কারণে সনয় নষ্ট হইলে সেই সময় পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। খেলা ড্র থাকিলে অনেক সময় অতিরিক্ত সময় খেলা।

খেলা আরম্ভ করিবার নিয়ম ঃ—প্রতিযোগিতা খেলা 'টস' করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। 'টসের' সময় রেফারী ও দুই দলের অধিনায়ক থাকেন। যে দল টসে জিতিবে সেই দল তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী 'সাইড' বা 'বল' নিয়া থাকে। এই ভাবে যে দল 'বল' পায় সেই দলই সেণ্টার হইতে প্রথম কিক্ করিয়া খেলা আরম্ভ করে। কেন্দ্র বৃত্তের বাহিরে বল না যাওয়া পর্যন্ত খেলা চালু হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। অর্দ্ধ সময়ের বিরতির পর বিপরীত দলের খেলোয়াড় এইভাবে কেন্দ্র বিন্দু হইতে বল মারিয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিবেন। কোন কারণে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ হইলে রেফারী বলটি 'ড্রপ' দিয়া আবার খেলা আরম্ভ করিবেন।

ফুটবল খেলার বিভিন্ন অবস্থা (Position)

ফাউল ঃ—কোন খেলোয়াড় নিম্নলিখিত কোন অন্যায় কাজ করিলে তাঁহার ফাউল হইবে।

(ক) বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে বল ছাড়াই লাথি মারিলে কিংবা লাথি মারার চেষ্টা করিলে।

(খ) বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়ের, উপর লাফাইয়া পড়িলে।

(গ) পা হঠাৎ সম্মুখে রাখিয়া বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে মাটিতে ফেলিয়া দিলে কিংবা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলে।

(ঘ) বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে মারাত্মক ভাবে চার্জ করিলে।

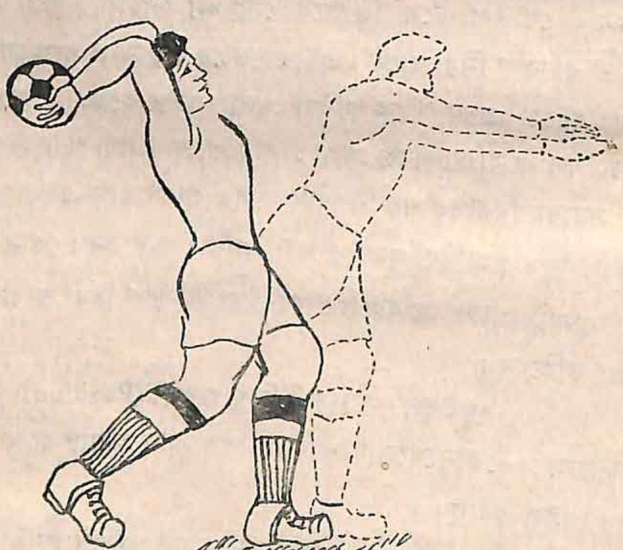
(ঙ) বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে আঘাত করিলে কিংবা আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে।

(চ) বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে হাত দিয়া ধরিলে।

(ছ) বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে হাতে ঠেলা দিয়া ফেলিয়া দিলে।

উল্লিখিত যে কোন কারণে রেফারী অন্যায়কারীর শাস্তিস্বরূপ তাঁহার বিপক্ষ দলকে ফ্রি-কিক্ করিতে দিবেন।

অফ সাইড ঃ—যখন গোলরক্ষক ব্যতীত ঐ দলের অন্য খেলোয়াড় না থাকেন এবং যখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের পিছন দিক হইতে বল আসে, তখন তাঁহার অফ সাইড হয়। কিন্তু এই রকম অবস্থায় কর্ণার কিক্ কিংবা থ্রো-বলের সময় অফ সাইড হইবে না।



থ্রো ঃ—বল স্পর্শ লাইনের বাহিরে চলিয়া গেলে আউট হয়।

সেই ক্ষেত্রে যিনি আউট করিয়াছেন তাঁহার বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়, বলটি যেখানে আউট হইয়াছে সেই স্থান হইতে, ভিতরের দিকে 'থ্রো' করিবেন। থ্রো করিবার সময় খেলোয়াড়ের মুখ মাঠের দিকে থাকিবে এবং তাহার দুইটি পায়ের প্রত্যেকটির আংশিক স্পর্শ লাইনের উপর অথবা মাঠের বাহিরে থাকিবে। তিনি বল থ্রো করিয়াই, কেহ স্পর্শ না করিলে, মারিতে পারিবেন না। মারিলে বিপক্ষ দল ফ্রি-কিক্ পাইবেন। থ্রো বল দিয়া সরাসরি গোল করা যায় না।

কর্ণার কিক্ ঃ—যদি রক্ষণভাগের কোন খেলোয়াড় দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া বল গোল লাইনের বাহিরে যায় তাহা হইলে আক্রমণকারী দল কর্ণার কিক্ পাইবেন। যে দিকে বলটি গোল লাইন পার হইবে সেই দিকের কর্ণার হইতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বল মারিবেন। প্রতিরক্ষাকারীরা সেই বলের ১০ গজের মধ্যে থাকিতে পারিবেন না। ঐ বল অপর কেহ স্পর্শ না করা পর্যন্ত কর্ণার-কিকার পুনরায় মারিতে পরিবেন না। এইরূপ করিলে রক্ষণভাগের দল ফ্রি-কিক্ পাইবেন।

গোল কিক্ ঃ—কোন খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের গোলের দিকে বল মারিলে উক্ত বল যদি গোল খুঁটির বাহিরের দিকে গোল লাইন পার হইয়া যায়, তাহা হইলে গোল এরিয়ার ভিতর হইতে বিপক্ষ দলের পশ্চাদ্ভাগের খেলোয়াড় গোল কিক্ করিবেন। যে দিকে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করিয়াছিল; সেই দিকের গোল-এরিয়ার অর্দ্ধাংশ হইতে বল মারিতে হইবে।

পেনাল্টি কিক্ ঃ—রক্ষণভাগ দলের কোন খেলোয়াড় যদি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ইচ্ছা করিয়া ক্রীড়াগত কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়। পেনাল্টি এরিয়ার বিশেষ চিহ্নিত স্থান হইতে পেনাল্টি কিক্ করা

হয়। বিপক্ষ দলের গোল রক্ষক ব্যতীত সকলেই পেনাল্টি এরিয়ার বাহিরে চলিয়া আসিবেন। অন্য কোন খেলোয়াড় স্পর্শ না করা পর্যন্ত যিনি পেনাল্টি কিক্ করিয়াছেন তিনি পুনরায় বল কিক্ করিতে পারিবেন না। হাফ্‌টাইম বা ফুলটাইম হইলেও পেনাল্টি কিক্ মারিতে হইবে। এই সময়ে গোল হইলেও উহাকে আইন সম্মত গোল বলিয়া ধরিতে হইবে।

ফ্রি-কিক্ ঃ—ফ্রি-কিক্ দুই প্রকারের—মুখ্য ও গৌণ।

মুখ্য ফ্রি-কিক্এ বল সরাসরি গোলে মারিয়া গোল করা যায়। কিন্তু গৌণ ফ্রি-কিকে বল সরাসরি গোলে মারিয়াই গোল করা যায় না। সে বল গোলে ঢুকিবার পূর্বে অন্য খেলোয়াড় কর্তৃক স্পৃষ্ট হইতে হইবে।

নিম্নলিখিত যে কোন অন্যায় করিলে বিপক্ষ দলকে গৌণ ফ্রি-কিক্ দেওয়া হয়।

(ক) যদি রেফারী দেখিতে পান যে কোন খেলোয়াড় বিপজ্জনক ভাবে গোল রক্ষকের হাতের বল মারিতে উদ্যত হইয়াছেন।

(খ) যদি বল দূরে থাকিবার সময় কোন খেলোয়াড় অন্য খেলোয়াড়কে কাঁধ দিয়া আক্রমণ করেন।

(গ) যদি কোন খেলোয়াড় নিজের আয়ত্তের মধ্যে বল আনিবার পূর্বে বিপক্ষ দলের কোন খোলোয়াড়কে বাধা প্রদান করেন।

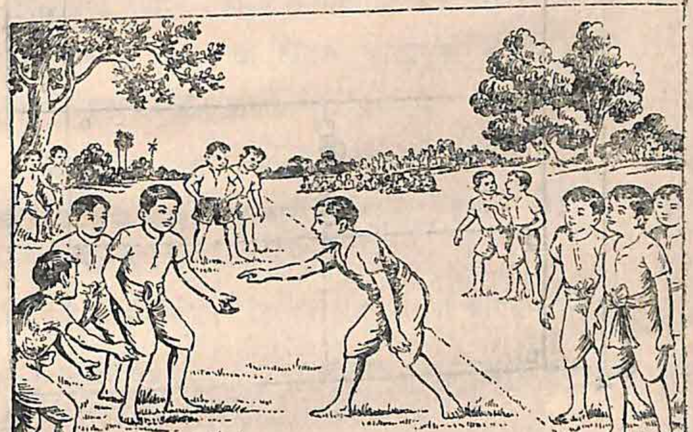
(ঘ) যদি কোন খেলোয়াড় বল না থাকার সময় গোল রক্ষককে চার্জ করেন।

(ঙ) যদি গোলরক্ষক মাটিতে মারা কিংবা শূন্যে নিক্ষেপ করার সময় ৪ বারের বেশী পদক্ষেপ করেন।

(চ) যদি গোলরক্ষক এমন কৌশল অবলম্বন করেন যাহাতে খেলার সময় অযথা নষ্ট হয়।

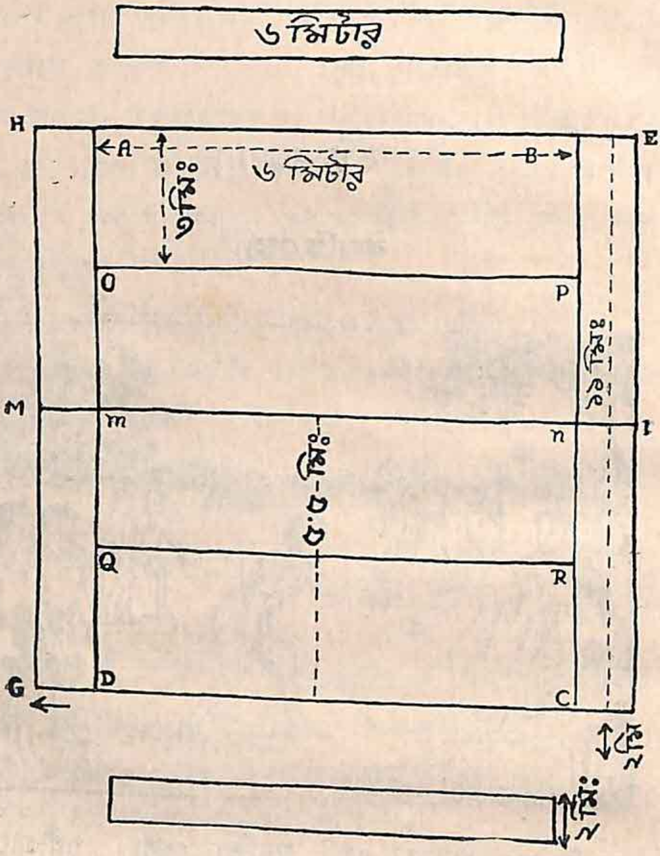
ষষ্ঠ অধ্যায়

কবাডি খেলা



কবাডি খেলা ভারতের একটি জনপ্রিয় খেলা। পল্লীগ্রামে এই খেলাকে হা-ডু-ডু খেলা বলে। হা-ডু-ডু-রই আধুনিক রূপ কবাডি। কোন কোন অঞ্চলে এই খেলাকে চিডুগুডু অথবা হুটুটু খেলা বলা হয়।

খেলার মাঠ ঃ—এই খেলার জন্য খুব নরম মাঠের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃমেয়েদের জন্য ও ১৬ বৎসরের কম ছেলেদের জন্য কবাডি মাঠের দৈর্ঘ্য হইবে ১১ মিটার ও প্রস্থ হইবে ৮ মিটার। মাঠটিকে আড়াআড়ি ভাবে দ্বি-খণ্ডিত করিবার পর প্রতি কোর্টের আয়তন হইবে ৫.৫ মিটার × ৮ মিটার। চূণ দিয়া ৫ সেন্টিমিটার মোটা করিয়া লাইনগুলি টানিয়া দিতে হইবে। কবাডি খেলার ছকটি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে।



A B C D হইল খেলার মাঠের সীমা। MN লাইন খেলার মাঠটিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাকে মিড ঃ লাইন বা মধ্য রেখা বলা হয়। মাঠের উভয়দিকে OP QR লাইন দুইটিকে বক্ লাইন (Banlk Line) বলে। এই বক লাইন দুইটি মধ্য রেখা হইতে ৩ মিটার দূরে থাকিবে এবং মধ্যরেখা MN-এর সমান ও সমান্তরাল হইবে। EF ও HG লাইন দুইটি যথাক্রমে BC ও AD হইতে ১ মিটার দূরে থাকিবে এবং BC ও AD রেখার সমান ও

সমান্তরাল হইবে। HGDA এবং BCEF ক্ষেত্র দুইটিকে লবি (Lobby) বলা হয়।

দল :—প্রতি দলে ৭ জন করিয়া খেলিবে। এই ৭ জন ছাড়াও ৫ জন খেলোয়াড় অতিরিক্ত থাকে। দরকার হইলে এই ৫ জনের ভিতর হইতে ৩ জনকে বদলী হিসাবে নামান যায়।

খেলার সময় :—প্রতি অর্ধে ১৫ মিনিট মোট ৩০ মিনিট এই খেলার সময়। মাঝে ৫ মিনিটের জন্য খেলার বিরতি থাকিবে। খেলা যদি ড্র হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত ৫ মিঃ+মিঃ=১০ মিঃ আরও খেলা হইবে।

গাওয়া :—এই খেলায় এক দমে বা নিঃশ্বাসে খেলিতে হয়। দমের সময় যে শব্দ বাহির হয় তাহাকে গাওয়া বলে। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্যান্ট (cant)।

মধ্য লাইন হইতে খেলোয়াড়কে গাওয়া আরম্ভ করিতে হয়।

আক্রমণকারী :—যে খেলোয়াড় অপর দলের সীমানায় গাহিতে যায় তাহাকে আক্রমণকারী বলে।

প্রতিরোধকারী :—আক্রমণকালে আক্রান্তদলের প্রত্যেককে প্রতিরোধকারী বলে।

মৃত হওয়া :—আক্রমণকারী যদি আক্রমণের সময় আক্রান্তদলের দ্বারা ধৃত হয় এবং ধরিয়া রাখা অবস্থায় যদি তাহার ডাক (গাওয়া) বন্ধ হইয়া যায় তবে সে মৃত বলিয়া ঘোষিত হইবে।

খেলা :—দুই দলের অধিনায়ক টসের মাধ্যমে খেলা শুরু করে। বিজয়ী অধিনায়ক পছন্দমত কোর্ট বাছিয়া নেয় এবং প্রথম আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয়।

প্রতি দলের একজন খোলায়াড় মধ্যবর্ত্তী লাইন হইতে 'কবাডি' 'কবাডি' শব্দ করিতে করিতে প্রতিরোধকারীদের কোর্টে প্রবেশ করে। যতক্ষণ তাহার দম থাকে, ততক্ষণ সে সেই কোর্টে থাকিতে পারে

নিজের কোর্টে ফিরিবার সময় একই দমে তাহাকে মধ্যবর্ত্তী লাইনপর্যন্ত পোঁছিতে হয়।

আক্রমণকারীরা যদি প্রতিরোধকারীদের কোর্টে গিয়া এক বা একাধিক খেলোয়াড়ের দেহের যে কোন অংশ স্পর্শ করে তবে তাহারা মরিয়া যায়। যে তাহাদের স্পর্শকরে তাহার দলের পক্ষে পয়েন্টহয়মাথা প্রতি এক করিয়া। আক্রমণকারীকে যদি প্রতিরোধকারী দল নিজের কোর্টে ধরিয়া রাখে তবে সেই প্রতিরোধকারী দল এক পয়েন্ট পায়।

কোন দলের খেলোয়াড়েরা মরিতে মরিতে যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে বিপক্ষ দল 'লোনা' পায়। ইহাতে বিপক্ষ দলের অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট হয়। সকলে মরিয়া যাওয়ার আগেও অনেক সময় বিপক্ষ দল 'লোনা' পাইয়া থাকে। কোর্টে ১ জন বা ২ জন খেলোয়াড় বাঁচিয়া থাকিতেও সেই দল পুরা দল নিয়া খেলা সুরু করিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে কয়জন বাঁচিয়া থাকিতে আত্মসমর্পণ করা হয়, লোনার অতিরিক্ত ২ পয়েন্টের সঙ্গে খেলোয়াড় প্রতি একটি করিয়া পয়েন্ট বিরোধী দল পাইয়া থাকে।

খেলা চলিবার সময় একদলের খেলোয়াড় অন্য দলের খেলোয়াড়ের (আক্রমণকারী) মুখ চাপিয়া দিয়া দম বন্ধ করিতে পারে না। খেলিবার সময় কাহাকেও আহত করা যায় না। আক্রমণকারী পাঠাইতে ৫ সেকেণ্ডের বেশী সময় নেওয়া যায় না। কোর্টের বাহির হইতে খেলারত কোন খেলোয়াড়কে নির্দেশ দেওয়া নিষেধ। এইসব কারণে অনেক সময় দণ্ড ভোগ করিতে হয়, দল বাতিল হইয়া যায়, এমনকি বিরোধী দল পয়েন্টও পাইতে পারে।

এইভাবে নির্দিষ্ট সময়ে খেলার পর যে দল বেশী পয়েন্ট পায় তাহারাই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হয়।

সতর্কতা ঃ—প্রতিটি খেলোয়াড়ের পোষাকের বুকে ও পিঠে বড় বড় অক্ষরে নম্বর লিখতে হয়, যাহাতে তাহাদের চিনিতে কষ্ট না হয়।

খেলা আরম্ভ হইবার আগে দেখিতে হইবে কাহারও হাতের বা পায়ের নখ যেন লম্বা না থাকে। তৈল জাতীয় কিছু যেন গায়ে না মাখে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পরিচালনা :—কবাডি খেলায় ১ জন রেফারী, ২জন আম্পায়ার ১ জন স্কোরার ও ২ জন সহকারী স্কোরার থাকেন। স্কোরাররা পয়েন্ট লিখেন। আম্পায়ার ২ জন খেলা পরিচালনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে মত পার্থক্য হইলে রেফারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন।

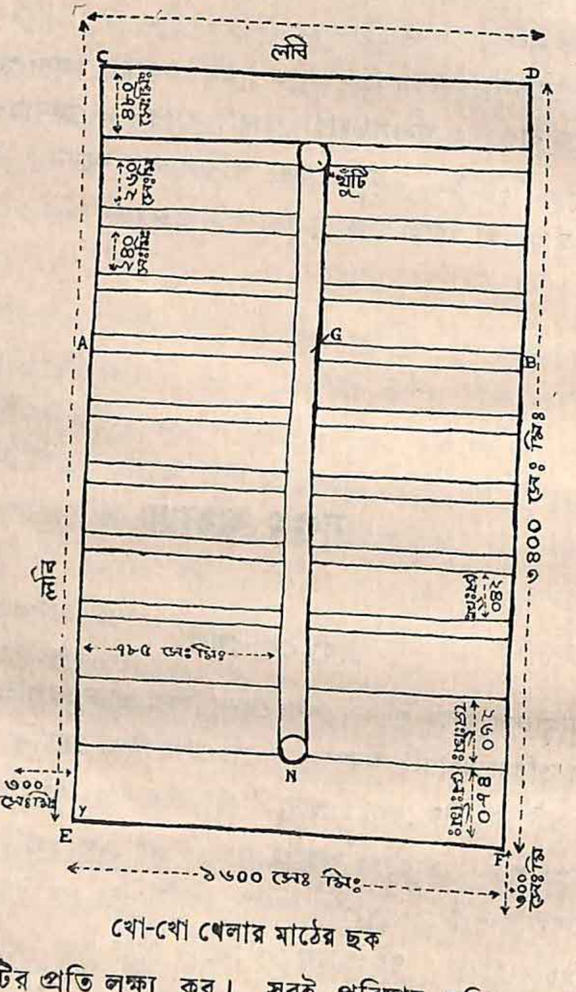
সপ্তম অধ্যায়

খো খো-খেলা

আমাদের কাছে ফুটবল খেলা যেমন প্রিয়, ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চলে খো-খো খেলা ঠিক তেমনি জনপ্রিয়। ইহা একটি ভারতীয় খেলা। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই খেলা সেখানে খুবই প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য অংশেও এই খেলা প্রচলিত আছে।

খেলার মাঠ :—খো-খো খেলার মাঠটি দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার ও প্রস্থে ১৬ মিটার হইবে। দুই প্রান্তে ১৬ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪˙৮ মিটার প্রস্থ পরিমিত জায়গা বাদ রাখিয়া দুইটি দণ্ড বা খুঁটি পোতা হয়। দুইটি দণ্ডকে একটি পথের দ্বারা সংযোগ করিতে হয়। ইহাকে কেন্দ্র পথ বলে। কেন্দ্র পথের দৈর্ঘ্য হইবে ২৪˙৪ মিটার ও প্রস্থ হইবে ৩০ সেন্টিমিটার। কেন্দ্র পথের উপরে সেন্টিমিটারের মাপের ৮টি ছোট বর্গক্ষেত্র থাকিবে। আবার কেন্দ্র পথের সমকোণে সমান দুইভাগে

বিভক্ত ৮টি এড়োপথ ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে।



খো-খো খেলার মাঠের ছক

মাঠের নক্সাটির প্রতি লক্ষ্য কর। সবই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।

দল :—খো-খো খেলায় দুইটি দল থাকিবে। একটি দলকে বলা হয় ধাবক ও আর একটি দলকে বলা হয় অনুধাবক। উভয় দলে ৯ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকে। অনুধাবকেরা ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর

বসিয়া থাকে। এই দলের পিছনে যাহারা ছুটিয়া বেড়ায় তাহাদের ছোঁয়ার জন্য, তাহাদের বলা হয় সক্রিয় অনুধাবক। যাহাদের পিছনে বা যাহাদের লক্ষ্য করিয়া দৌড়ান হয় তাহাদের বলা হয় ধাবক।

খেলা—টসে জিতিবার পর বিজয়ী অধিনায়ক জানায় তাহারা ধাবক হইবে বা অনুধাবক হইবে। ৮ জন অনুধাবক ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া বসে।

অনুধাবক বিপক্ষদলের (ধাবক) খেলোয়াড়দের ছোঁয়ার চেষ্টা করে। সে কাহাকেও ছুইতে না পারিলে নিজের দলের একজনকে স্পর্শ করে ও সঙ্গে সঙ্গে জোরে 'খো' শব্দ করে। এইবার 'খো' পাওয়া খেলোয়াড় উঠিয়া পড়িলে 'খো' দেওয়া খেলোয়াড় সেই জায়গায় বসিবে।

খেলার আগে ধাবক দল তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়। এক সঙ্গে ৩ জন করিয়া মাঠে নামে। সক্রিয় অনুধাবকেরা ৩ জনকে ছুইয়া আউট করিলে আর একটি উপদল মাঠে নামে।

খো-খো খেলায় ৭ মিনিট করিয়া একটি আবর্ত্ত হয়। দুইটি আবর্তে একটি ইনিংস হয়। মোট দুই ইনিংস খেলা চলে।

অনুধাবক দল যতজন ধাবকবে আউট করে, প্রথম দলের তত পয়েন্ট হয়। ৭ মিনিটের আগে যদি সকলে আউট হইয়া যায় তবে তাহাকে বলা হয় লোনা। এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য অবশ্য পয়েন্ট পাওয়া যায় না।

যাহারা বেশী পয়েন্ট পায়, রেফারী তাহাদের বিজয়ী ঘোষণা করেন। সমান পয়েন্ট হইলে অতিরিক্ত একটি পর্যায় খেলা হয়। সেই খেলাও যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে নূতন করিয়া খেলা শুরু করিতে হইবে। কোন দলে ১২ কিংবা ততোধিক পয়েন্ট পাইলে বিপক্ষদলকে আর একটি পর্য্যায় খেলিতে বাধ্য করে।

মাঠের দুই পাশে দুইজন আম্পায়ার এই খেলা পরিচালনা করেন।

অষ্টম অধ্যায়

হকি খেলা



ফুটবল এবং ক্রিকেটের মত হকিখেলা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও এত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হকিতেই সম্মান অর্জন করিয়াছে বেশী। ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারত বহু বৎসর ধরিয়া হকিতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া আসিয়াছে।

কবে এবং কোথায় হকি খেলার প্রচলন হইয়াছিল তাহা বলাশক্ত। ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট কাউন্টিতে অবস্থিত ব্ল্যাকহীথ প্রাচীনতম হকি ক্লাব। প্রথম আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে।

হকি খেলার নিয়ম-কানুন অনেকটা ফুটবল খেলার মত। তবে কোন কোন দিক দিয়া এই খেলার মধ্যে অনেকটা পার্থক্যও আছে। হকি আইনে কুড়িটি ধারা আছে। আবার এই সকল ধারার অনেক উপধারাও আছে। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে হকি খেলার মোটামুটি নিয়মগুলি আলোচনা করা হইল।

খেলার মাঠ—খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য হইবে ১০০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ গজ বা ৬০ গজের বেশী হইবে না। মাঠটি আয়তক্ষেত্রাকার হইবে।

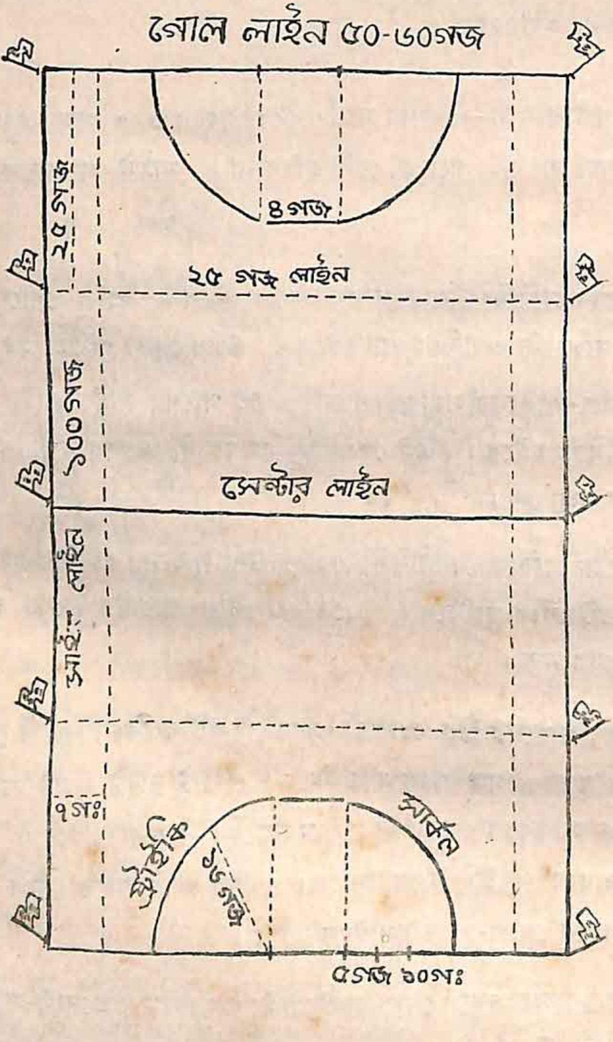
মাঠের চারিদিকে সাদা দাগ টানিতে হইবে। প্রতি গোলে দুই দিকের দাগগুলি ৩ ইঞ্চি চওড়া হইবে। উভয় গোল হইতে ২৫ গজ দূরে গোল-লাইনের সমান্তরাল করিয়া দুই পাশের সাইড লাইন পর্যন্ত দাগ টানিতে হইবে। এই খেলাকে রক্ষণকারী দলের 'পঁচিশ গজ এলাকা' বলা হয়।

মাঠের চারিকোণে চারিটি, এবং সেণ্টার লাইনের দুইদিকে দুইটি—মোট দশটি ফ্ল্যাগ থাকিবে। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাগ পোস্টের উচ্চতা হইবে চারি ফুটের মত।

গোল লাইনের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোলটি থাকিবে। দুইটি গোল-পোস্টের মধ্যে ৪ গজ ব্যবধান থাকিবে। পোস্ট দুইটি একটি ক্রশবার দ্বারা যুক্ত থাকিবে। ভূমি হইতে ক্রশবারের উচ্চতা হইবে ৭ ফুট। পোস্ট ও বার দুই ইঞ্চি চওড়া হইবে। গোলে জাল দিতে হইবে আর ইহার পিছনে গোল-বোর্ড বসাইতে হইবে।

দুই গোলের সম্মুখে গোল-লাইন হইতে ১৬গজ দূরে গোল-লাইনের সমান্তরাল করিয়া ৪ গজ লম্বা এবং তিন ইঞ্চি চওড়া সাদা লাইন টানিতে হইবে। লাইনটিকে দুই দিকে এমনভাবে টানিয়া নিতে হইবে,

যেন উহা গোল-লাইনের সঙ্গে মিশিয়া দুইধারে একটি বৃত্ত তৈয়ার করে। এই লাইনগুলি এবং গোল লাইন দ্বারা পরিবেষ্টিত জায়গাটিকে ষ্ট্রাইকিং



সার্কেল বলা হয়। ষ্ট্রাইকিং-সার্কেল দেখিতে অনেকটা ইংরাজী 'D' অক্ষরের মত।

বল ঃ—বলটি হইবে গোলাকার। ইহার রং সাদা হইতে হইবে। ইহার ওজন ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্সের বেশী হইবেনা। বলের পরিধি ৮$\frac{১৩}{১৬}$ ইঞ্চির কম কিংবা ৯$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বেশী হইবে না।

স্টিক ঃ—হকি স্টিক ওজনে ২৮ আউন্সের বেশী কিংবা ১২ আউন্সের কম হইবেনা। স্টিকের বাম দিকটি সমতল হইতে হইবে এবং মাত্রদিক দিয়াই বল খেলিতে হইবে। ইহার অগ্রভাগ ধারবিশিষ্ট হইবে না কিংবা ইহাতে ধাতু নির্মিত কিছু থাকিবেনা।

বুট ঃ—অপর খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে এইরূপ বুট পরিধান করা নিষেধ।

বুলি ঃ—নিজ গোল লাইন ডান দিকে রাখিয়া ও পাশের লাইনের দিকে মুখ করিয়া উভয় দলের একজন খেলোয়াড় দাঁড়াইবে। মাঠের মধ্যস্থলে বলটি রাখিয়া প্রত্যেক খেলোয়াড় একবার স্টিক দ্বারা ভূমি ও তারপর একটু উপরে তুলিয়া বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের স্টিক-এ আঘাত করিবেন। এইরূপ তিনবার করিবার পর যেকোন একজন বল মারিয়া খেলা আরম্ভ করিবেন। ইহাকে বুলি বলা হয়। হাফ-টাইমের পর এবং প্রত্যেক গোলের পর এইরূপ বুলি করিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হইবে।

গোল ঃ—দুই গোল পোস্টের ভিতর দিয়া এবং ক্রশবারের নীচে দিয়া বল যদি গোল লাইন পার হইয়া যায় তবেই গোল হইয়াছে বলা হয়। গোল করিবার জন্য আক্রমণকারীকে বৃত্তের সীমানা হইতে বল মারিতে হইবে।

ফ্রি-হিট্ ঃ—১৬ গজের মধ্যে প্রতিরক্ষা দল ফ্রি-হিট্ পাইলে তাহা গোল লাইনের সহিত সমান্তরাল সেই বিন্দুর ভিতর দিয়া অঙ্কিত লাইনের উপর যেকোন স্থান হইতে মারিতে পারিবেন। এই বল স্কুপ মারা নিষেধ। এই বল মারিবার সময় ৫ গজের মধ্যে কেহ থাকিতে

পারিবেনা। বলের গায়ে স্টিক না লাগিলে খেলোয়াড় আবার বল মারিতে পারিবেন। ফ্রি-হিট্ করিবার পর অপর কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করা পর্যন্ত, যিনি ফ্রি-হিট্ করিয়াছেন, তিনি বল স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

বৃত্তের বাহিরে উপরের নিয়ম ভঙ্গ করিলে বিপক্ষ দল ফ্রি-হিট্ পাইবেন। বৃত্তের ভিতরে আক্রমণকারী দলের কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রতিরক্ষাকারী দল ফ্রি-হিট্ পাইবেন।

অফ্‌সাইড :—যদি কোন আক্রমণকারী খেলোয়াড় বিপক্ষের গোলের নিকটে থাকে এবং তাঁহার সম্মুখে বিপক্ষ দলের তিনজন খেলোয়াড় না থাকেন, তখন বল মারিবার জন্য চেষ্টা করিলে তাঁহার অফ্-সাইড হইবে। কেহ অফ্-সাইড হইলে প্রতিরক্ষা দল ফ্রি-হিট্ পাইবেন।

রোল-ইন :—বল পার্শ্ব লাইনের বাহিরে গেলে অপর দলের কোন খেলোয়াড় সেই স্থান হইতে গড়াইয়া বল মাঠের ভিতর দিবেন। ভূমির উপর দিকে এই বল মারা নিষেধ। মাঠেয় পার্শ্ব লাইনের বাহিরে দাঁড়াইয়া এবং স্টিক্ ও পা লাইনের বাহিরে রাখিয়া যথাশীঘ্র বল ভিতরে গড়াইয়া দিতে হইবে। অপরের স্পর্শ করিবার পূর্বে উক্ত খেলোয়াড় সেই বল মারিতে পারিবেন না। বল গড়াইয়া দিবার সময় কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে বিপক্ষ দল বল রোল-ইন করিবেন।

কর্ণার :—প্রতিরক্ষাকারী দলের গোল লাইন কিংবা পাশের লাইনের কর্ণার ফ্ল্যাগের তিন গজ দূরবর্ত্তী যেকোন স্থান হইতে কর্ণার মারিতে পারা যায়। কর্ণার বলে সরাসরি গোল হয় না। বিপক্ষ দলের যিনি কর্ণার মারিবেন তিনি ছাড়া সকলেই গোল-বৃত্তের বাহিরে থাকিবেন।

পেনাল্টি কর্ণার :—এই ক্ষেত্রে আত্মরক্ষাকারী দলের গোলের যে

কোন গোল-লাইনের উপর হইতে ফ্রি-হিট্ নিতে হইবে। অবশ্য গোল পোস্ট হইতে দশ গজ ছাড়িয়া দিয়া। আত্মরক্ষাকারী দলের সর্বাধিক ৬ জন খেলোয়াড় গোল-লাইনের পিছনে থাকিতে পারিবেন। অন্যেরা হিট্ নেওয়া পর্যন্ত সেন্টার-লাইনের পিছনে থাকিবেন।

পেনাল্টি ষ্ট্রোক :—যদি কোন প্রতিরক্ষাকারী দলের খেলোয়াড় গোল বাঁচাইবার জন্য বৃত্তের ভিতরে ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহা হইলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি ষ্ট্রোক্ পাইবেন। যদি কোন খেলোয়াড় বৃত্তের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করেন এবং তাহার জন্য নিশ্চিত গোল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি স্ট্রোক পাইবেন।

গোলের মধ্যবিন্দু হইতে ৮ গজ দূরে মাঠের ভিতর হইতে আক্রমণ-কারী দলের একজন খেলোয়াড় পেনাল্টি ষ্ট্রোক করিবার সময় আক্রমণ-কারী বল মারিবার কোন ভান করিবেন না। পেনাল্টি ষ্ট্রোকের সময় খেলোয়াড় ২৫ গজ লাইনের বাহিরে অবস্থান করিবেন।

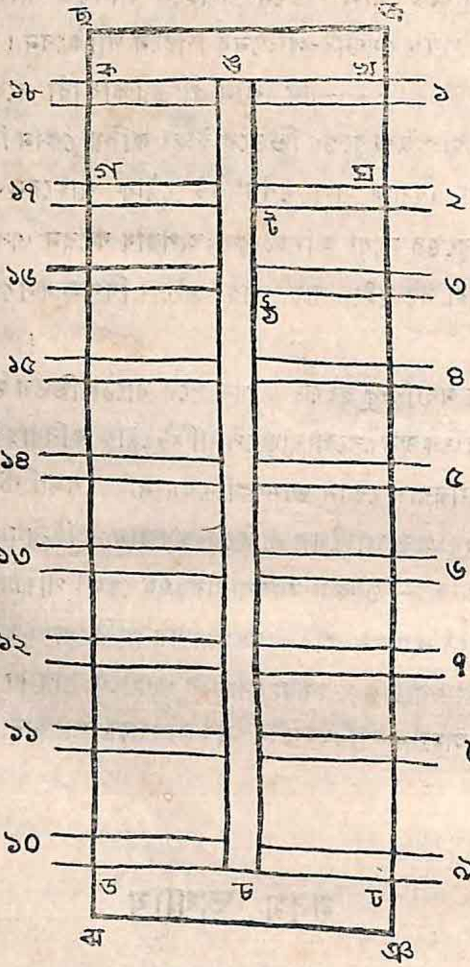
আম্পায়ার :—দুইজন আম্পায়ার এই খেলা পরিচালনা করিবেন। প্রতি অর্দ্ধমাঠে একজন করিয়া আম্পায়ার থাকিবেন। উভয় আম্পায়ার বা একজন আম্পায়ার থাকেন, সেখানে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন লাইন্সম্যান থাকিবেন। সব ব্যাপারে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

নবম অধ্যায়

দাড়িয়া বান্ধা

ইহা একটি দেশীয় খেলা। পশ্চিম-ভারতে দাড়িয়াবান্ধা খেলাকে 'আতাপাতা' খেলা বলা হয়। কোন কোন জায়গায় ইহাকে 'গাদী' খেলা বলে।

খেলার মাঠ ঃ—মাঠটি আড়াআড়ি লাইনে বিভক্ত হইবে। প্রতি লাইনের দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ১ ইঞ্চি ও চওড়া ১৩ ইঞ্চি হইবে। এক



দাড়িয়াবান্ধা মাঠের ছক

একটিকে দুর্গ বা পাতি বলে। একটি কেন্দ্রীয় পথ ৯টি দুর্গকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিবে। ইহাকে বলে কেন্দ্রীয় দুর্গ বা সুর-পাতি।

কেন্দ্রীয় দুর্গ লম্বায় ৮৯ ফুট ১ ইঞ্চি ও চওড়ায় ১৩ ইঞ্চি। সংলগ্ন দুইটি সম্মুখ লাইনের দূরত্ব থাকে ১১ ফুট। আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দুর্গের সংযোগ স্থলে ১৩ ইঞ্চি × ১৩ ইঞ্চি মাপের একটি করিয়া ৯টি বর্গ-ক্ষেত্র তৈয়ার হয়। সম্মুখের দুর্গ ও পিছনের দুর্গের সমান্তরাল দুইটি লাইন টানা হয় ১১ ফুট দূরে। এই দুইটি শেষ লাইন। সাইড লাইনগুলি শেষ লাইনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

খেলার নিয়ম ঃ—এই খেলায় প্রতিদলে ৯ জন করিয়া থাকে। টসে জিতিলে বিজয়ী দলের অধিনায়ক ঠিক করে তাহারা আক্রমণ করিবে না রক্ষা করিবে। আক্রমণকারীরা ৯টি দুর্গ আক্রমণ করে। একটি দুর্গ অতিক্রম করিলেই ১০ পয়েণ্ট পায়। 'লোনা' হইলে আক্রমণ-কারীরা ১৮০ পয়েণ্ট পায়।

তিন ইনিংসে এই খেলা খেলিতে হয়। এক ইনিংস খেলায় ৭ মিনিট সময় লাগে। প্রতি ইনিংসের শেষে ৫ মিনিট করিয়া বিশ্রাম দেওয়া হয়। তিন ইনিংস খেলায় যাহারা বেশী পয়েণ্ট পাইবে তাহারাই বিজয়ী হইবে। সমান পয়েন্ট হইলে অতিরিক্ত ইনিংস খেলিতে হয়।

আক্রমণকারীরা বাউণ্ডারী লাইনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। ৯ জন রক্ষক ৯টি দুর্গে দাঁড়াইয়া থাকে সম্মুখের দিকে মুখ করিয়া। সুর বা গ্রেনেভার কেন্দ্রীয় দুর্গে দাঁড়ায় স্কোয়ার কাট বা স্পর্শের জন্য। স্কোয়ার কাট না করিলে কোন আক্রমণকারীকে সে আউট করিবার অধিকারী হয় না। অন্যান্য রক্ষকরা নিজ নিজ দুর্গের যে কোন দিকে গিয়া আক্রমণকারীদের বাধা দিতে পারে।

পরিচালনা ঃ—দাড়িয়াবান্ধা খেলা পরিচালনা করিতে ১ জন রেফারী, ৯ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার ও ১ জন মার্কার প্রয়োজন হয়। ৯ জন আম্পায়ার দুর্গের দিকে লক্ষ্য রাখেন। স্কোরার দেখেন কে আউট হয়।

দশম অধ্যায়

লাঠি খেলা

[আত্মরক্ষামূলক খেলা]

লাঠিখেলা সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলা। বিপ্লবীযুগে ভারতের সর্বত্র লাঠিখেলা ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ছিলেন লাঠিখেলার জনক। আজ গ্রামে বা শহরে লাঠি খেলা প্রায় অবলুপ্তির পথে। তবে এখনও কোন কোন স্থানে আত্মরক্ষামূলক লাঠি খেলার প্রদর্শনী দেখা যায়।

প্রয়োজনীয়তা :—লাঠিখেলা দম ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় মেদ দূরীভূত হয়। শরীর কর্মঠ ও সবল রাখিতে লাঠিখেলা অত্যন্ত প্রয়োজন। লাঠিখেলায় পারদর্শিতা লাভ করিলে শত্রুপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়। আত্মরক্ষার জন্য লাঠি খেলা একটি সহজ উপায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর খেলা :—লাঠিখেলা নানা প্রকারের হয়, যথা—বেনেটি, হাড়ুয়া, বড় লাঠি রং খেলা, ফ্রি-ফাইট, ছোট লাঠি রং খেলা ইত্যাদি।

বেনেটি :—এই লাঠির দুই প্রান্তে ছোট বল জোড়া থাকে। বিভিন্ন-ভাবে পর্যায়ক্রমে দুই হাতে এই লাঠি ঘোরানো হয়। বেনেটি বহু রকমের আছে—যথা, বেনেটি এবং বেনেটি দুই, বেনেটি তিন········ ইত্যাদি।

হাড়ুয়া ঃ—লাঠির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা হাড়ুয়া। ইহাকে বড় লাঠি খেলাও বলে। লাঠি হইবে বাঁশের। প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চতা অনুযায়ী লাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে। হাড়ুয়াতে বহু রকমের প্যাঁচ আছে। হাড়ুয়া খেলার সময় লাঠি এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলে যে লাঠিখানি দেখা যায় না, শুধু ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যায়। হাড়ুয়ার প্যাঁচ জানা থাকিলে লাঠিসহ ২৫।৩০ জন আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা যায়।

বড়লাঠি রং খেলা ঃ—হাড়ুয়া খেলা শিখিলে বড় লাঠি রং খেলা শিক্ষা করা যায়। এই খেলায় এক পক্ষ লাঠি নিয়ে মারিতে যায়; অন্য পক্ষ লাঠি দিয়া সেই মার প্রতিরোধ করে। দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে—যেমন শির, তামেচা, দে, বাহেরা, হুল, ভাণ্ডার, রুটি, ঘন, পালটি, কড়ক।

ফ্রি-ফাইট ঃ—এই খেলার আরেক নাম বড় লাঠি ছুট্। যাহারা বড় লাঠি রং খেলায় খুব পারদর্শী একমাত্র তাহারাই ফ্রি-ফাইট খেলিতে পারে। কেননা ইহা একটি আসল খেলা। এই খেলায় কেহ বাধা-মানেনা। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করে। অনেক সময় কেহ কেহ গুরুতরভাবে জখম হয়। তবে রেফারী বাঁশী বাজাইলে থামিয়া যাইতে হইবে।

ছোট লাঠি রং খেলা ঃ—সাধারণতঃ এই লাঠি বেতের হয়। ইহার দৈর্ঘ্যও ছোট। ইহার দৈর্ঘ্য খেলোয়াড়ের হাতের মাপে ২ হাত ৮ অঙ্গুল হইবে। এই লাঠি এক হাতে ধরিয়া খেলিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

ব্রতচারী

ব্রতচারীর স্রষ্টা গুরুসদয় দত্ত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তিনি ব্রতচারী সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ২৪ পরগণা জিলার বড়িশাতে যে ব্রতচারী সমিতি আছে তাহা তিনিই গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী জাতির মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। অল্প দিনের মধ্যেই ব্রতচারী সমিতির চিন্তাধারা দেশবাসীর মনে দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের জীবনকে সব দিক হইতে সফল, সার্থক ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার অভিষ্ট নিয়া যাহারা ব্রত ধারণ করেন, তাহাদিগকেই বলা হয় ব্রতচারী। এই ব্রত পাঁচ ভাগে বিভক্ত—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। সংক্ষেপে এই ব্রতগুলিকে বলা হয় জ্ঞা-শ্র-স-ঐ-আ। যিনি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি পালন করিতে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছেন, সেই পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকাকেই আমরা বলি ব্রতচারী।

ব্রতচারীর আদর্শের দুইটি দিক আছে—একটি ব্যক্তিমুখী, অপরটি সমাজমুখী। ব্যক্তিমুখী বলিতে বুঝায় ব্যক্তির নিজের চরিত্র, চিন্তা, কর্ম ও দেহকে উন্নত করা ; আর সমাজমুখী বলিতে বুঝায় সমষ্টিগত ভাবে সমাজের চরিত্র, চিন্তা, কর্ম ও দেহকে উন্নত করা। এই সমাজ-প্রেম হইতেই আসে দেশ-প্রেম বা ভূমি-প্রেম।

ভূমি-প্রেমের তিন উক্তি—
"আমি বাংলাকে ভালবাসি।"
"আমি বাংলার সেবা করব।"
"আমি বাংলার ব্রতচারী"

বাংলার ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞা—

ব্র ত লয়ে সাধব মোরা বাংলা সেবার কাজ,
বাংলা সেবার সাথে সাথে ভারত সেবার কাজ,
ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব মানব সেবার কাজ।
ত রুণতার সজীব ধারা আনব জীবন মাঝ।
চা ই আমাদের শক্ত দেহ, মুক্ত উদার মন।
রী তিমত অনুসরণ করব প্রতি কাজ।

ব্রতচারী নাচ ও গানের মাধ্যমে দেশের তরুণরা শরীর চর্চায় খুব উৎসাহ ও আনন্দ পায়। কেননা ব্রতচারীর গানগুলি ছন্দে, তালে ও বোলে খুবই সহজ, সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

কয়েকটি ব্রতচারী-গান ঃ—

বাংলা ভূমির মাটি

মোদের বাংলাভূমির মাটি
তোমার শহর গ্রাম ও বাটি
সমজনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি॥
করব পানার নির্ব্বাসন
কেটে গাছের নিবিড় বন
বইয়ে দিব আলো হাওয়ার মুক্ত বিচরণ;
সাধব মোরা নিত্য তোমার ধনের বিবর্দ্ধন—
খাটি।

কোদাল চালাই

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই

ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে "পালাই পালাই,"
পেটের খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই।
চল্ কোদাল চালাই

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

মানুষ অচেনাকে চিনিতে চায়, অজানাকে জানিতে চায়। তাই বদ্ধঘরে সে বেশীদিন থাকিতে চায় না। তেমনি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের পাঠ যখন ছাত্র-ছাত্রীদের এক ঘেয়ে করিয়া তোলে তখন মাঝে মাঝে তাহাদের নিয়া শিক্ষা ভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত। আজ কাল অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিয়া দীঘা, পুরী, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, রাজগীর প্রভৃতি নানা দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়াইতে যান।

এই শিক্ষা ভ্রমণে বহুবিধ সুফল পাওয়া যায়। যথা ঃ—

১। ছাত্রদের মনের অবসাদ কাটিয়া গিয়া প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়।

২। অজানাকে জানিয়া তাহারা অনেক কিছু শিখিতে পায়।

৩। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থান ও বস্তুগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৪। একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইলে তাহাদের মধ্যে একতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা দেয়।

৫। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে ছাত্ররা বাস্তব পরিস্থিতি সম্মুখীন হইতে শিখে।

৬। দলপতির প্রতি তাহারা আনুগত্য প্রকাশ করিতে শিখে।

পরিচালনা ঃ—প্রথমে গন্তব্য স্থান ঠিক করিতে হইবে। তারপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ছাত্রদের অভিভাবকদের অনুমতি পত্র পাইলে দল গঠন করিবেন। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দলপতি হন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য হইতে উপ দলপতি ঠিক করা হয়। দলপতিকে পথের নিশানা জানিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র বা অংশ গ্রহণকারী নিজ নিজ বিছানা (ছোট), থালা গ্লাস, জলের বোতল, ব্যাগ, জামা-কাপড়, টর্চলাইট প্রভৃতি সঙ্গে নিবে। বাসে ভ্রমণ করিলে কিছু খড় একটি বড় শতরঞ্চি নিতে হইবে। খড় গুলি নীচে পাতিয়া তাহার উপর শতরঞ্চি দিলে ছেলেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পারে। সঙ্গে একটি ফার্ষ্ট এড বক্সও নিতে হইবে। প্রত্যেকে একটি করিয়া মানচিত্র ও ডাইরি নিবে। পথের নিশানা জানিতে মানচিত্র তাহাদিগকে খুবই সাহায্য করিবে। ডাইরী হইতে ছাত্রেরা প্রতি দিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিবে। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের নিয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন এবং প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন জিনিসের তাৎপর্য ছাত্রদের সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিবেন। ছাত্ররা সেগুলি প্রথমে ডাইরী বইতে নোট করিয়া নিবে। শিক্ষক মহাশয়কে দিয়া সেই ডাইরী বই সই করাইয়া নিতে হইবে পরে বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়া ভ্রমণ সূচীর উপর সকলেই একটি প্রবন্ধ লিখিবে। যাহার রচনা সর্বাপেক্ষা ভাল হইবে, তাহা বিদ্যালয়ের পত্রিকায় ছাপাইতে হইবে। ইহাতে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহবৃদ্ধি পায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশ মাতৃকাকে বন্দনা করা হয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্ত্তব্য তাহাদের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে সম্মান প্রদর্শন করা ও মর্য্যাদা দান করা।

জাতীয় সঙ্গীত সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থাতে গীত হইয়া থাকে।

১। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়,

২। বিদ্যালয়ের প্রার্থনার সময়,

৩। সভা-অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা,
জনগণমঙ্গল-দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতও চর্চা করা কর্তব্য। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শিক্ষার ফলে :—

(১) তরুণদের মনে দেশপ্রেম জাগরিত হয়,

(২) জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পায়,

(৩) তরুণ প্রাণকে সাহসিকতায় ও নিষ্ঠাবান কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা ॥
তুমি মিলেছ মোর দেহের মনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্ত্তি মর্মে গাঁথা ॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে
তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল সহা সকল সহা মাতার মাতা ॥
ওমা অনেক তোমার খেয়েছিগো অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানুদিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তি দাতা।

(২)

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান হবে জয় ॥
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ;
ভারতে জনম,, পুনঃ আসিবে সুদিন
ওই দেখ প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয় ॥

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়,
জগজন মানিবে বিস্ময় ॥
ন্যায় বিরজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ভরে—
সত্যের নাহি পরাজয়
সত্যের নাহি পরাজয় ॥

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২। ব্যায়ামের সাধারণ নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। খালি হাতে ব্যায়াম বলিতে কি বুঝায়? কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়ামের নাম কর।

২। ড্রিল মার্চিং বলিতে কি বোঝ? কি ভাবে স্যালুট করিতে হয়?

৩। মেয়েদের ১ নং, ৩ নং, ও ৬ নং খালি হাতে ব্যায়ামের নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা বর্ণনা কর।
কয়েকটি যোগ ব্যায়ামের নাম কর।

২। চক্রাসন, সর্বাঙ্গাসন ও ধনুরাসন কি ভাবে করিবে?

চতুর্থ অধ্যায়

১। সাঁতার কাটা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। সাঁতার কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? ইহাদের নাম লিখ। কোন সাঁতার কি ভাবে কাটিবে?

৩। সাঁতার প্রতিযোগিতার সময় কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে?

৪। ডাইভিং কি? ইহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ফুটবল খেলার মাঠের ছক আঁকিয়া দেখাও।

২। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ও পোষাক কেমন হইবে?

৩। খেলার মাঠে রেফারী ও লাইন্সম্যানের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বর্ণনা কর।

৪। ফুটবল খেলা কি ভাবে আরম্ভ হয়? এই খেলা কতক্ষণ চলে?

৫। কি কি কারণে রেফারী ফাউলের নির্দেশ দিয়া থাকেন?

৬। ফ্রি-কিক্ সম্বন্ধে কি জান?

৭। ফুটবল খেলার নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ:—
(ক) পেনালটি কিক্, (খ) অফসাইড, (গ) থ্রো, (ঘ) কর্ণার কিক্।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। নক্সা আঁকিয়া কবাডি খেলার একটি মাঠের বিবরণ দাও।

২। কি ভাবে কবাডি খেলা হয় নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

৩। টীকা লিখ:—গাওয়া, লোনা।

সপ্তম অধ্যায়

১। ছক কাটিয়া একটি খো-খো খেলার মাঠের বিবরণ দাও।

২। খো-খো খেলার নিয়ম বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। একটি ছকের সাহায্যে হকি খেলার মাঠের বিবরণ দাও।

২। হকি খেলার বিভিন্ন নিয়মাবলী উল্লেখ কর।

৩। আম্পায়ারের ক্ষমতা বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

১। দাড়িয়াবান্ধা খেলার মাঠ ছকের সাহায্যে আঁকিয়া দেখাও।

২। দাড়িয়া বান্ধা খেলার নিয়ম বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

১। লাঠি খেলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। বিভিন্ন প্রকারের লাঠি খেলা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

একাদশ অধ্যায়

১। ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা কে? কাহাদিগকে ব্রতচারী বলা হয়?

২। ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞাগুলি উল্লেখ কর।

৩। একটি ব্রতচারী সঙ্গীত মুখস্থ লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। শিক্ষামূলক ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। শিক্ষামূলক ভ্রমণ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত কোন্ কোন্ সময় গাওয়া উচিত?

২। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটি মুখস্থ লিখ।

৩। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীতের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

৪। একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত মুখস্থ লিখ।

তৃতীয় খণ্ড

সমাজসেবা ও বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম

প্রথম অধ্যায়

রোগ-পরিচর্যা

শুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

এমন অনেক রোগ আছে যেখানে ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষা দ্বারাই রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা যায়। সুতরাং রোগীর জীবন ও রোগমুক্তি উভয়ই অনেক খানি নির্ভর করে শুশ্রূষাকারীর উপর। কাজেই শুশ্রূষাকারীর কাজ অতি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ এবং গৃহ-পরিচালনায় গৃহীর নিপুণতা গৃহশুশ্রূষার মধ্যদিয়াই প্রকাশ পায়। আজকাল আমাদের দেশে বহু সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি উদাহরণ স্বরূপ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

শুশ্রূষাকারীর গুণ ঃ—

১। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শুশ্রূষার কাজ নিতান্ত সহজ ও সকলের দ্বারাই সম্ভব, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ রোগে ভুগিয়া রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ও মন বিকল হইয়া ওঠে, মানসিক স্থিরতা নষ্ট হয় ও কথাবার্তা, চালচলন সকলই যেন সংগতিবিহীন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে রুগ্নব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা অন্যান্য কর্তব্য কর্ম সম্পাদন অপেক্ষা অনেক দুরূহ কাজ।

২। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মনিষ্ঠা ব্যতীত সু-চিকিৎসা ও শুশ্রূষা কোনটাই সম্ভব নয়। সুতরাং রোগীর স্নান, আহার, ঔষধপত্রাদি নিয়মিত সময়ে দিবার জন্য শুশ্রূষাকারীর নিয়মনিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় রোগের উপশম

না হইয়া বরং অনেক সময়ে উহা মারত্মক আকার ধারণ করে এবং ফলে রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

৩। পরিচ্ছন্নতা শুশ্রূষার মূলনীতি, কেবল রোগীর দিকেই নয়, শুশ্রূষাকারীর নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারেও যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন, সহজ এবং বাহুল্যবর্জিত হওয়া দরকার।

৪। রোগীর ও চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য শুশ্রূষাকারীর আর একটি প্রধান গুণ। রোগীর আরোগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর উপরেই। সুতরাং চিকিৎসকের নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকা শুশ্রূষাকারীর একান্ত প্রয়োজন। রোগীর অনুগত থাকার অর্থ রোগীর বিশ্বাস অর্জন করা। এই বিশ্বাসের অভাবে অনেকক্ষেত্রে রোগী সুস্থ হইতে বিলম্ব হয়।

৫। রোগপরিচর্যায় সর্ব্বশেষে দরকার একটি সংবেদনশীল মন। গৃহ এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুশ্রূষার ভার ন্যস্ত হয় নারীর উপরেই। কারণ নারীর মন স্বভাবতই কোমল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও সেবাপরায়ণ হইয়া থাকে।

রোগীর ঘর :—

রোগীর পরিচর্যা করিতে গেলে প্রথমেই রোগীর ঘরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীর ঘরটিতে যাহাতে প্রচুর আলো বাতাস থাকে তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ঘরটি যেন স্যাঁত-স্যাঁতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোগীর আসবাবপত্র :—

রোগীর ঘরে বেশী আসবাবপত্র রাখা উচিত নহে। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি রোগীর ঘরে রাখিতেই হইবে।

১। রোগীর জন্য একটি খাট বা তক্তপোষ,

২। একখানি টেবিল,

৩। হাতমুখ ধুইবার পাত্র,

৪। ঔষধ-পত্র খাবার ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি ছোট আলমারি,

৫। থুথু ফেলিবার জন্য ঢাকনাযুক্ত পিকদানি,

৬। মলত্যাগের জন্য একটি বেডপ্যান,

৭। মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য একটি ইউরিন্যাল,

৮। শুশ্রূষাকারিণীর জন্য চেয়ার, টেবিল, খাতা, পেন্সিল, থারমোমিটার, ঘড়ি ইত্যাদি,

৯। রোগীকে যাহারা দেখিতে আসিবেন তাঁহাদের বসিবার জন্য একটি বেঞ্চ।

রোগীকে ঔষধ খাওয়ান ঃ—

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার কাজ শুশ্রূষাকারীর উপরেই ন্যস্ত থাকে। এই ঔষধ দিবার সময় শুশ্রূষাকারীর কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। যে জাতীয় ঔষধই ব্যবহার করা হউক না কেন, প্রতিটি শিশির গায়ে রোগীর নাম, বার, কতঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়গুলি লিখিয়া রাখা দরকার। কোন বিষ ঔষধ থাকিলে উহার গায়ে "বিষ" এই লেবেল আঁটিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা অন্য খাইবার ঔষধ হইতে আলাদা করিয়া আলমারীতে রাখিতে হইবে।

ঔষধ দিবার সময় নির্দিষ্ট সময়ের একটুও ব্যতিক্রম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ঔষধ দিবার পূর্বে লেবেলখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইবে, এবং শিশিটা বেশ করিয়া ঝাঁকাইয়া লইতে হইবে। নিত্য ব্যবহার্য ঔষধগুলির সহিত শুশ্রূষাকারীর মোটামুটি পরিচয় থাকে, সুতরাং আরও সতর্ক হইবার জন্য ঔষধের ছিপি খুলিয়া গন্ধ শুঁকিয়া দেখা দরকার ঔষধ ঠিক আছে কিনা। ছিপিটি উল্টা করিয়া কোন পরিষ্কার পাত্রের উপর রাখিয়া ঔষধের মাপ অঙ্কিত গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া মুখের এদিকে ওদিকে না পড়ে এমনি সতর্ক ভাবে রোগীর মুখে ঢালিয়া দিতে হইবে এবং উহার

ফলাফল লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারের জন্য রিপোর্ট লিখিয়া রাখিতে হইবে। ঔষধের গ্লাসের কিনারাগুলিতে শুশ্রূষাকারীর হাত লাগিয়া তাহা যেন দূষিত না হয়। ঘুম ভাঙ্গাইয়া কখনও রোগীকে ঔষধ দিতে নাই। কারণ ঘুম ও বিশ্রাম রোগীর পক্ষে ঔষধ অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয়।

ঔষধ দিবার সময় সর্ব্বদা একখানি পরিষ্কার ট্রেতে করিয়া পরিষ্কার কাপ, চামচ, খাবার জলের গ্লাস, ঔষধের শিশি ও মাপের গ্লাস সাজাইয়া লইতে হইবে এবং ভাল করিয়া হাত ধুইয়া লইয়া ঔষধ দিতে হইবে।

রোগীর পথ্য ঃ—

সুস্থ অবস্থায় যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, অসুস্থ অবস্থায় তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র কম নয়। বরং জ্বর প্রভৃতি রোগে দেখা যায় কর্মশক্তির ব্যয় সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা অনেকাংশে বেশীই হইয়া থাকে। অতি ভোজনের ফলে যদি কোন ব্যক্তি উদরাময় জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে দু'একদিন উপবাস কিংবা স্বল্পাহারে বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং পাকস্থলী বিশ্রাম পাইবার জন্য উপকারই হইয়া থাকে। এই সময় দেহে সঞ্চিত মেদরাশি হইতে দেহ তাহার কর্মশক্তি টানিয়া লয়। অপর পক্ষে জ্বর প্রভৃতি রোগে যে রোগী দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভুগিতেছে তাহাকে অথবা যাহার পুষ্টির অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়াছে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনবহুল খাদ্য দিতে হইবে। জ্বর ও অন্যান্য সক্রামক ব্যাধিতে ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ইহা দেহে সঞ্চিত থাকে না বলিয়া খাদ্য হইতেই ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় রোগীর ক্ষুধা ও হজমের ব্যাঘাত হইতে পারে এবং পুষ্টির অভাবে ক্ষয়সূচক রোগ দেখা দিতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন জ্বরে আক্রান্ত রোগীর খাদ্য, দুধ, ডিম, মাখন, চিনি, মধু, টাটকা ফল প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক।

পক্ষান্তরে যাহারা শারীরিক স্থূলতার দরুণ রক্ত চাপ, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের কম ক্যালোরি বিশিষ্ট সবজী ইত্যাদি খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাংস দিতে হইলে চর্বিহীন মাংস এবং চিনির পরিবর্তে স্যাকারিণ দিতে হইবে।

পাকস্থলীতে ক্ষত হইলে ঝাল ও মস্‌লাবিহীন সিদ্ধ তরকারী ও দুধ ভাত খাইতে দিতে হইবে। শোথ রোগ হইলে কম লবণবিশিষ্ট খাদ্য দেওয়া দরকার এবং যকৃতের ব্যাধিতে স্নেহ জাতীয় খাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। আবার ক্ষয়জাতীয় রোগীর জন্য প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার দরকার।

বিশেষতঃ জ্বরের রোগীর জন্য সাবু, বার্লিওয়াটার প্রভৃতি সহজপাচ্য তরল খাদ্যই নির্বাচিত করিতে হইবে। প্রত্যেক রোগীর পথ্যই যাহাতে সহজ পাচ্য, টাটকা, ভেজালশূন্য এবং ভিটামিনবহুল হয়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টিরাখা প্রয়োজন।

রোগীকে খাদ্য পরিবেশনের সময় ঔষধের মত চিকিৎসকের নির্দেশমত বার ও সময় ঠিক রাখা দরকার। তরল খাদ্য দুইঘণ্টা অন্তর এবং কঠিন পথ্য সাধারণতঃ ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইয়া থাকে। আহার পরিবেশনের সময় যথাসম্ভব প্রফুল্ল মনে পরিবেশন করা দরকার। ক্ষতিকর না হয় এরূপভাবে সামান্য একটু এদিক ওদিক করিতে হইলেও তাহা দ্বারা খাদ্য রুচিকর করা প্রয়োজন। কোন কারণে মানসিক ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তি বা দৈহিক অতিরিক্ত কষ্টের পরেই রোগীর মনের অবস্থায় একটু পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত খাদ্য পরিবেশন করা উচিত নয়।

রোগীর স্নানঃ—

রোগী স্নান করাইবার ছোট গামছা, গামলা, গরম জলের জাগ, ঠাণ্ডাজল, সাবান, ওডিকলন, পাউডার, চিরুনী ইত্যাদি জোগাড় রাখিতে হইবে। খুব সতর্কতার সহিত রোগীকে স্নান করাইতে হইবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। স্নানের পর ভালভাবে গা মুছিয়া

দিতে হইবে। মাথা ধুইয়া দিবার সময় অয়েল ক্লথ পাতিয়া নিতে হইবে।

রোগীর বিছানা ঃ—

রোগীর বিছানা খুব পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বালিশটি চাদরের নীচে থাকিবে। অয়েলক্লথের উপর রোগীকে শোয়াইতে হইবে। অয়েলক্লথে কিছু পাউডার ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। শোয়াইবার পর রোগীর শরীর একটি চাদর কিংবা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা (*First Aid*)

পেন্সিল কাটিতে হাত কাটা, দৌড়াদৌড়ি করিতে হঠাৎ পা কাটিয়া যাওয়া, এবং গরম চা বা দুধ গায়ে পড়িয়া ফোসকা পড়া ইত্যাদি ছোট-বড় দুর্ঘটনা আমাদের জীবনে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। এই সকল দুর্ঘটনায়ও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল সময় ডাক্তার পাওয়া সম্ভব হয় না অথবা প্রয়োজনও হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়া থাকি—ইহাকেই বলা হয় প্রাথমিক চিকিৎসা।

পুড়িয়া যাওয়া রোগীকেও ডাক্তার না আসা পর্যন্ত একেবারে বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখা সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর যন্ত্রণার কিছুটা উপশম করিতে এবং রোগীর অবস্থা যাহাতে কঠিনতর না হয় সেইজন্যও দুর্ঘটনার পর অবিলম্বে কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়—ইহাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

দুর্ঘটনা আকস্মিক ভাবে ঘটে। কাজেই ইহার প্রতিকারের জন্য প্রতি গৃহস্থেরই প্রস্তুত থাকা দরকার। এইজন্য কতকগুলি নিয়মকানুন জানা দরকার—তাহা না হইলে অনেক সময় ভাল করিতে যাইয়া

রোগীর অপকার হইয়া যায়। ইহা ছাড়া কিছু সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র যোগাড় রাখাও প্রয়োজন, যেমন—কয়েকটি পরিষ্কার কাপড়ের ছোট-বড় টুকরা, কয়েকটি ছোট-বড় ব্যাণ্ডেজ, ছোট ছুরি ও কাঁচি, বোরিক তুলা, কয়েকটি পরিষ্কার কাঠি, কার্বলিক সাবান, টিঞ্চার আয়োডিন, টিঞ্চার বেনজিন, ডেটল, বোরিক পাউডার, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, স্পিরিট, বার্ণল, ইত্যাদি। এইসকল জিনিষগুলি রাখিবার জন্য এক ধরণের বাক্স পাওয়া যায়—তাহাকে বলে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (First aid Box). ইহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিলে ঐগুলি ঠিক ভাবে থাকে এবং প্রয়োজনের সময় সুবিধামত পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনা নানারকমের ঘটিতে পারে। কিন্তু বাড়ীতে প্রতিদিনের কাজ করিতে গিয়া কাটিয়া যাওয়া এবং পুড়িয়া যাওয়া—এই দুই ধরণের দুর্ঘটনা বেশী ঘটে বলিয়া নীচে এই দুইটি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইল।

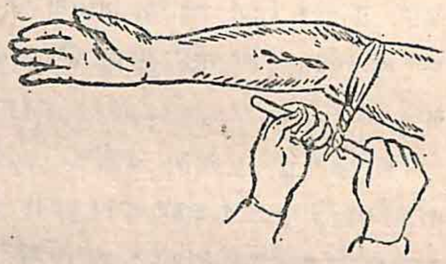
শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলেই রক্তপাত হয়। সেইজন্য প্রাথমিক চিকিৎসার প্রথম লক্ষ্য হইল রক্তপাত বন্ধ করা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল ক্ষতস্থান যাহাতে কোন ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করা।

সামান্য কাটিয়া গিয়া অল্প রক্ত পড়িতে থাকিলে, ক্ষতস্থান আঙুল দিয়া কিছুক্ষণ চাপিয়া রাখিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায় বটে কিন্তু ক্ষতস্থানকে ক্ষতিকর জীবাণু হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটু তুলায় কিছু স্পিরিট ঢালিয়া তাহা দ্বারা ভালভাবে ক্ষতস্থান মুছিয়া ডেটল বা টিঞ্চার আয়োডিন ভিজানো তুলা ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে; প্রয়োজন হইলে উহা এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ক্ষতস্থান দিয়া বেশী রক্ত বাহির হইতে থাকিলে ডেটল বা টিঞ্চার

বেনজিনে তুলা ভিজাইয়া তা দ্বারা জোরে চাপিয়া ধরিতে হয় এবং প্রয়োজন হইলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হয়।

ক্ষতস্থান দিয়া বেশ বেগে রক্ত বাহির হইতে থাকিলে রক্তপাতের নমুনা দেখিয়া শিরা বা ধমনী কোনটি কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে তাহা বুঝিয়া রক্তপাত বন্ধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রক্ত যদি ঈশৎ নীলাভ হয় এবং একটানা দর দর ধারে রক্ত বাহির হইতে থাকে তবে বুঝিবে শিরা কাটিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের একটু নীচের দিকে জোরে টিপিয়া ধরিতে হইবে অথবা এক টুকরা দড়ি বা কাপড়ের পাড় দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত ফিনকি দিয়া বাহির হইতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে ধমনী কাটিয়া গিয়াছে। এইক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের একটু উপরে টিপিয়া ধরিতে হইবে অথবা দড়ি বা পাড় দিয়া কষিয়া বাঁধন দিতে হইবে। যদি সাধারণ বাঁধনে



রক্তপাত বন্ধ না হয় তবে ঐ বাঁধন একটু ঢিলা করিয়া একটি শক্তকাঠি দড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতে হইবে। ইহাতে বাঁধন বেশ শক্ত হইয়া রক্তপাত বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ বাঁধন বেশী সময় রাখা নিরাপদ নয়। কাজেই পনের বা কুড়ি মিনিট পর পর বাঁধন একটু ঢিলা করিয়া দেখিতে হইবে রক্তপাত বন্ধ হইয়াছে কিনা। ধমনী কাটিলে এইরূপ বাঁধন দিতে হয়। রক্তপাত বন্ধ হইলে ক্ষতস্থানে টিঞ্চার বেনজিন ও তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া উপযুক্ত ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে।

'ক্ষত সামান্য বা বেশী যাহাই হউক না কেন, ইহা যাহাতে কোনও রূপে ক্ষতিকারক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেইদিকে বিশেষ

লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ক্ষতস্থান কখনও জল দিয়া ধুইতে নাই—কারণ জলে নানারূপ জীবাণু থাকিতে পারে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার সময় হাত ভালভাবে কার্বলিক সাবানে অথবা ডেটল মিশ্রিত জলে ধুইয়া লইতে হইবে। ব্যবহারের কাপড়, তুলা, কাঁচি প্রভৃতি গরম জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে। রক্তপাত বন্ধ হইবার পর ডাক্তার দ্বারা এ্যান্টিটিটেনাস্ বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ বিরোধী ইনজেক্সন লইতে হইবে।

পুড়িয়া যাওয়া (Burns)

দুই প্রকারে দেহের কোন অংশ পুড়িয়া যাইতে পারে। ফুটন্ত জল, গরম দুধ বা তেল বা চা, ভাতের মাড়, উত্তপ্ত বায়ু, অ্যাসিড্ ইত্যাদি হাতে-পায়ে বা শরীরের অন্য কোথাও লাগিয়া সেই স্থানে পুড়িয়া গেলে তাহাকে বলা হয় ঝলসানো। কিন্তু আগুনে সাক্ষাৎভাবে কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তাহাকে বলা হয় আগুনে পোড়া। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা হইল প্রথমেই ক্ষতস্থান গরম জলে অতি শীঘ্র ধুইয়া এবং এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় দিয়া ধীরে ধীরে আলগাভাবে মুছিয়া লইতে হইবে। পরে একটু তুলায় কিছু স্পিরিট লইয়া ঐ স্থানে লাগাইলে রোগী বেশ আরাম বোধ করিবে। ঐস্থানে সঙ্গে সঙ্গে 'বার্ণল' লাগাইতে পারিলে জ্বালাযন্ত্রণা খুব কম হয় এবং ক্ষতও অতি শীঘ্র সারিয়া যায়।

অনেক সময় অসাবধানতার জন্য ছোট ছেলেমেয়েদের এমনকি বয়স্কদেরও জামা-কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়। এই অবস্থায় আগুনে আক্রান্ত ব্যক্তি যাহাতে ছুটাছুটি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি খুলিয়া ফেলা সম্ভব না হয় তবে তৎক্ষণাৎ জামা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতেও অসুবিধা হইলে অতি শীঘ্র কোন মোটা কম্বল, লেপ,

তোষক ইত্যাদি যাহা নিকটে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে চাপা দিতে হইবে। কারণ ইহাতে বায়ুর সংস্পর্শ না পাইয়া আগুন খুব সহজেই নিভিয়া যাইবে। জল দিয়া কখনও ঐরূপ আগুন



মোটা জিনিস দিয়া চাপিয়া ধরিবে

নিভাইতে নাই এবং ফোস্কা পড়িলে তাহা গালিয়া দিতে নাই। গালিয়া দিলে পোড়ার ক্ষত সারিতে বেশ বিলম্ব হয়। বেশী পুড়িলে রোগীকে যত সত্বর সম্ভব হাসপাতালে বা উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাটক, বিতর্ক, আলোচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অঙ্কন প্রভৃতির ব্যবস্থা

পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নাটক, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বিতর্ক-সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক আনন্দ ব্যতীত তাহাদের নিকট বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। শুধুমাত্র পড়াশুনা তাহাদের নিকট একটি ভীতির কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই ছাত্র-জীবনকে বৈচিত্রময় করিয়া তুলিতে হইলে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির আয়োজন করিতে হইবে। এই সমস্ত কাজের ভিতর দিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার ও বলিবার সাহস অর্জন করে। তাহাদের জড়তা কাটিয়া যায়।

নাটক ঃ—সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে, স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নাটকের আয়োজন করা হয়। পূজার ছুটি কিংবা গ্রীষ্মের ছুটিতেও তাহারা নাটক করিতে পারে। আজকাল ছাত্রদের উপযুক্ত বহু স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত নাটকের বই বাছিয়া দিবেন ; তারপর রিহার্স্যেল দিয়া তাহাদের তৈয়ার করিবেন। শ্রেণী-কক্ষেও পড়াশুনার অবসরে ছোট একটি দৃশ্যকে বাছিয়া নিয়া নাটক করা যায়। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের নাটক লিখিয়া আনিতে উৎসাহ দিবেন। তারপর সাজ-সজ্জা, সিন খাটানো প্রভৃতি কাজেও তাহারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে। নাটকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করে।

আবৃত্তি ঃ—নাটকের মত আবৃত্তিতেও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। আবৃত্তির জন্য শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখা কবিতা হইতেই নেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করাইলে তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। প্রতি বিদ্যালয়েই কথকতা পাঠ বা আবৃত্তির প্রচলন থাকা দরকার। আবৃত্তি করার একটি বিশেষ রীতি আছে। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের এই ব্যাপারে পরিচালনা করিবেন।

আলোচনা ও বিতর্ক

কোন বিশেষ শিক্ষামূলক বিষয় নিয়া আলোচনাকেই বিতর্ক বলা হয়। বিতর্কের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দুইটি দলে বিভক্ত হইবে। শিক্ষক মহাশয় বিতর্কের জন্য একটি বিষয় বাছিয়া দিবেন। একদল ছাত্র-ছাত্রী এই বিষয়ের পক্ষে বলিবে ; অপর দল ইহার বিপক্ষে যুক্তি দেখাইবে। যে পক্ষের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারাই বিজয়ী হইবে। শিক্ষক মহাশয় এই বিতর্ক-সভা কিংবা আলোচনা-সভা পরিচালনা করিবেন। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ ঘটে, যুক্তি-তর্ক ও আলোচনার নিয়ম-কানুন শিক্ষা লাভ করে। মাঝে মাঝে কোন শিক্ষাবিদকে বিদ্যালয়ে আনিয়া তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের শোনাইবার ব্যবস্থা করা ভাল। কোন বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী নিজেরাই আলোচনা করিতে পারে। এই ব্যাপারেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাহাদের সাহায্য করিবেন।

অঙ্কন-প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভা লুকাইয়া থাকে। কেহ কেহ অঙ্কনে বেশ পারদর্শী। সুতরাং বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষক

শিক্ষিকাগণ তাহাদের উপযুক্ত পরিচালনা দিবেন। যাহার অঙ্কন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে তাহা বিদ্যালয়ের পত্রিকায় ছাপাইতে হইবে এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ের প্রাচীর-পত্রিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন রাখিলে ভাল হয়। বিদ্যালয়ের কোন উৎসবের দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আলপনা আঁকাইলে তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ বাড়িয়া যায়।

সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা

অনেক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুল-সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীত প্রভৃতির খুব চর্চা চলিতেছে। এই ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ভাল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাহাদের উৎসাহিত করিবেন। যাহার সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে তাহাকে পুরস্কার দিতে হইবে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অনুপ্রেরণা জাগে।

বিদ্যালয়-পত্রিকা

বিদ্যালয় পত্রিকা বা স্কুল-ম্যাগাজিন বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রতি বিদ্যালয়েই বৎসরে একটি কিংবা দুইটি পত্রিকা বাহির হয়। এই পত্রিকায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই ছোট ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি লিখিতে শিখে ছোট বয়স হইতেই। কিন্তু অনেক সময়ই সুযোগের অভাবে তাহাদের এই মেধা এবং প্রতিভা উন্মেষ লাভ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের পত্রিকা তাহাদের এই প্রতিভা-

বিকাশের একটি উপায়। বিদ্যালয়ের পত্রিকায় নিজের রচনা দিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়িয়া উঠে। নিজেদের লেখা ছাপা-অক্ষরে দেখিতে পাইয়া তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। বিদ্যালয় জীবন হইতে লেখায় অভ্যাস করিয়াই অনেকে ভবিষ্যতে বড় কবি ও সাহিত্যিক হইয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে তাহাদের খুব উৎসাহ দিতে হইবে। একজন কিংবা দুইজন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর এই পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব থাকে। সম্পাদক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে যে সকল রচনা পাইবেন সেগুলির মধ্য হইতে ভাল ভাল রচনাগুলি নির্বাচন করিয়া, তারপর পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কার দান করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। বিদ্যালয়ের পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-শক্তি ও মনন-শক্তি বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। শুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। শুশ্রূষাকারিণীর কিরূপ গুণ থাকিবে ?

৩। রোগীর ঘর ও আসবাবপত্র কিরূপ হইবে ?

৪। রোগীকে কিভাবে পথ্য দিবে ?

৫। রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম কি ?

৬। রোগীকে কিভাবে স্নান করাইবে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। প্রাথমিক চিকিৎসা বলিতে কি বোঝ ?

২। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কি কি জিনিসের দরকার হয় ?

৩। দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করা উচিত ?

৪। আগুনে পুড়িয়া গেলে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করিবে ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। বিদ্যালয়ে নাটক ও আবৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। বিদ্যালয়ে বিতর্ক সভা কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় ?

৩। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সুফল বর্ণনা কর।

৪। বিদ্যালয়ের পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে উপকৃত করে ?

৫। কিভাবে পত্রিকা সম্পাদনা হয় ?